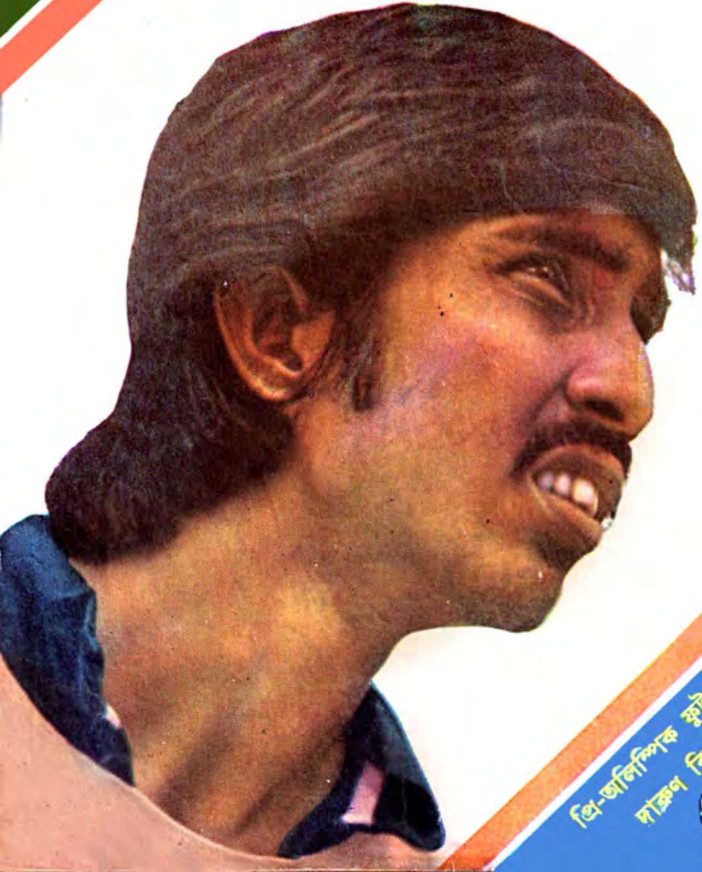
খেলাধুলোর নির্ভীক পাক্ষিক

খেলার কাগজ

১ এপ্রিল ১৯৮০

সুরজিতরা ইস্টবেঙ্গল ছাড়ল কেন?



প্রি-অলিম্পিক ফুটবলের দারুণ রিপোর্ট





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



শ্যাম থাপা / প্রদীপ সোম

খেলার কাগজ

১ এপ্রিল ১৯৮০

অভিনন্দন !

● প্রকাশ পাড়ুকোনকে—ডেনিস, সুইডিশ এবং অল-ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টনে চ্যাম্পিয়ন হবার জন্য।

● পি কে ব্যানার্জীকে—টীম ভাল না হওয়া সত্ত্বেও, কথা রেখে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য।

● রাম্বু মুখার্জীকে—রঞ্জিট্রফিতে দিল্লির বিরুদ্ধে দু'টি সংগ্রামী ইনিংস খেলার জন্য।

ধিক্কার !

● সুখবিন্দার সিংকে—রোভার্স ফাইনালে জে সি টী ডেম্পোর কাছে হেরে যাবার পর রেফারীকে আক্রমণ করার জন্য।

● জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তকে—আই এফ এ সহ-সম্পাদক হয়েও একটি ক্লাবের হয়ে দলবদলের বাজারে নামার জন্য।

● সি ই এস সি-র হকি খেলোয়াড় সতীন্দর পাল সিংকে লীগ-ম্যাচে আম্পায়ার সৌমেন্দ্র রায়কে নিগৃহীত করার জন্য।

সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত

বার্তা সম্পাদক : সরোজ চক্রবর্তী। শিল্পী : অনুপ রায়।

প্রচ্ছদের ছবি : শান্তি সেন।

পিছনের রঙীন ছবি : শ্রেণিক শেঠ।

অন্যান্য ছবি : প্রদীপ সোম, শ্রেণিক শেঠ, জেনাস ফোটো এজেন্সি, পি কে চৌধুরী এবং শান্তি সেন।

দলবদলের নাটক

অশোক দাশগুপ্ত

ইস্টবেঙ্গল নামক বিরাট ক্লাবের অনেক সুখ দুঃখ রৌদ্রবৃষ্টির সাথী শঙ্কর ভাই—অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেল, তাইনা ? চোদ্দ থেকে উনিশ—সব ফাঁকা। চোদ্দ—প্রশান্ত, পনেরো—সুরজিৎ, ষোলো—শ্যামল, সতেরো—চিন্ময়, উনিশ—ডেভিড আর আঠারো নম্বর ? তাকে তো অনেক দুঃখে গতবছরই আপনার ক্লাবটেন্ট ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। কেন সব ফাঁকা ? কেন এমন হল ? শঙ্কর ভাই, আপনি সব জানেন। স—ব জানেন। কিন্তু যারা জানেননা, তাদের অবগতির জন্য সব কিছু আবার শুরু থেকে বলা দরকার।

উনিশশো আটাত্তরে ডুরাণ্ড খেলতে গেছে ইস্টবেঙ্গল। কথায় কথায় ইস্টবেঙ্গলের এক কর্মকর্তা পিন্টুকে বললেন "সামনের বার সুরজিৎকে রাখবনা।" পিন্টু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছিল, "বলেন কী ! আপনারা কি পাগল হয়েছেন ?"

না, ও'রা ষড়যন্ত্রী হলেও পাগল নন। সুরজিৎকে উনআশিতে ঘাটাননি। কারণ, পিন্টুর সঙ্গে ঐ কথাবার্তার কয়েকদিনের মধ্যেই ইতিহাস রচিত হল। তারকাখচিত মোহনবাগানকে পরিষ্কার তিন গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ড পেল মূলত সুরজিতেরই নৈপুণ্যে। দলবদল শুরু হবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা ঢোঁক গিললেন। শানানো ছুরিটা তখনকার মতো পকেটে রেখে ভাবলেন, "পরে দেখা যাবে।"

কিন্তু অসভ্য সুরজিৎ, বেয়াড়া সুরজিৎ উনআশির লীগের শুরু থেকেই চমৎকার ফর্মে ছিল। শানিত ছুরিটায় তখনও পিন্টুর রক্তের ছিটে, কিন্তু সুরজিতের ফর্ম কর্মকর্তাদের সাময়িকভাবে বিরত রাখল। এরপর পিন্টু চৌধুরীর মহান প্রতিশোধ ইস্টবেঙ্গলকে লীগের লড়াই থেকে ছিটকে দিল। কোচ অরুণ ঘোষ অপসারিত হলেন। সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ি থেকে প্লেয়ার্স লিস্ট এল। সিলেকশনে সিনিয়র প্লেয়ার সুরজিৎ আর শ্যামলকে ডাকা বন্ধ হল। এবং সন্তর্পণে, শানিত ছুরি বেরিয়ে এল।

দেবরাজকে অত্যাচারে জর্জরিত করল তিন বীর পাঞ্জাবী—কর্মকর্তারা দোষীর পক্ষেই দাঁড়ালেন। সুরজিৎ প্রতিবাদ করল। অপদার্থ কর্মকর্তারা তরুণ বসুকে অপমানিত করলেন—সুরজিতের নেতৃত্বে ফুটবলাররা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াল। ম্যাচের চুক্তি তৈরি, কর্মকর্তারা শুধু সময়ের অপেক্ষায় থাকলেন।

দার্জিলিংতে ইস্টবেঙ্গল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে হারল। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে জাওরা নাচ নেচে এসে তিন পাঞ্জাবী তখন নিজেদের ঘরে পরবর্তী উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। উত্তেজিত সুরজিৎ আর নিশ্চুপ তরুণের পাশ দিয়ে সত্যজিতের ঘরে গেলাম। সত্যজিৎ মিত্র বলেছিল, "এই পাঞ্জাবীরা থাকলে সামনের বার টীম থাকবেনা। এরা যা খুশি তাই করছে।"

টীম করেছিলেন দুই ম্যানেজার এবং অস্থায়ী কোচ ধনরাজ। সুরজিৎ ধারেকাছে ছিলনা। কোচ বলা সত্ত্বেও এক গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় মাঠে নামলনা হরজিন্দার। তবু কলকাতায় ফিরে এসে এক কর্মকর্তার হাত ধরে তিন পাঞ্জাবী দৈনিক পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে এল, সুরজিৎই মনজিৎ-হরজিন্দারকে বসিয়ে রেখেছে। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক 'অর্জুন' গুরদেব সিং মাঠে থেকে কী দুর্দান্ত খেলার নমুনা রেখেছিলেন, তা অবশ্য বিবৃতিতে বলা হয়নি।

দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক যুবক সুরজিৎকে ঘিরে ধরল। একজন বলল, 'আমরা তো অন্ধকার দেখছি। আমাদের ক্লাবের কী হবে?' জোরাল শব্দ করে সুরজিৎ জবাব দিল, 'এখন সন্ধ্যে, অন্ধকার। কিন্তু কাল সকালে তো সূর্য উঠবে। ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে অন্ধকার সাময়িক, সূর্য উঠবেই।' হায়, সুরজিৎ জানত না, শানানো ছুরিটায় দিল্টুর রক্তের ছিটে তখন মোছা হয়ে গেছে, পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের অপেক্ষায়।

কলকাতায় ফিরে এসে সুরজিৎ দেখল, তিন পাঞ্জাবীর অপপ্রচারে মসৎ দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 'মহান' কর্মকর্তারা। কোচ অমলের রিপোর্ট বিলকুল চেপে দেওয়া হল। পরের বছরের জন্য কিছু 'অ্যাডভান্স' নিয়ে বুক ফুলিয়ে পাঞ্জাবে ফিরে গেলেন তিন সিং। সুরজিতের সঙ্গে একবারও যোগাযোগ করা হলনা। একবারও না। আরব সফর থেকে ভয়ঙ্কর চোট নিয়ে ফিরে এল ইস্টবেঙ্গলের এক নম্বর ফুটবলার। চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করা তো দূরের কথা, ভদ্রতার খাতিরে একবার দেখা পর্যন্ত করলেন না প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মকর্তারা। দু'টো ক্রিকেট টেস্টম্যাচ হয়ে গেল, অনেক খেলোয়াড়ের বাড়িতে গিয়ে টিকিট দিয়ে আসা হল। কিন্তু সুরজিৎ সেনগুপ্তর টিকিট? ছিঃ, তাই কখনো হয়।

আবু ধাবি থে'কে দারুণ অফার এল। স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরির কথা ভেবে সুরজিৎ গেলনা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে ততোদিনে উনিশশো আশির টীম তৈরির চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। ও'রা সবার কাছে যাচ্ছেন, শুধু সুরজিৎ বাদ। এই অবস্থায়, এক গভীর রাত্রে সুরজিৎ বলল, 'ভাবছি আর খেলব না। ব্যাঙ্কে প্রায় ষোলশো টাকা মাইনে পাই, একটা ফ্ল্যাট কিনেছি, না খেয়ে মরব না। আর খেলা? আট বছর বড় টীমে খেলা হল, ইস্টবেঙ্গল আর বেঙ্গলের ক্যাপ্টেনও হয়েছি। ইণ্ডিয়ার ক্যাপ্টেন আমাকে কখনো করা হবেনা। তাহলে আর খেলে কী করব? ইস্টবেঙ্গলের কেউ আসছে না। ইস্ট-বেঙ্গলেই যদি না খেলি, ফুটবল খেলে কী হবে?'

এই সেই সন্ধিক্ষণ, সেই সংকট মুহূর্ত — যখন মাত্রার আসরে 'বিবেক'-এর আবির্ভাব ঘটে। মূর্তিমান 'বিবেক' হিসেবে আবির্ভূত হল দিল্টু চৌধুরী: "কেন খেলা ছাড়বে? খুব ভাল জায়গা থেকে শুনেছি, তোমাকেও আমার অবস্থায় ফেলার চেষ্টা অফিসিয়ালরা করছেন। কিন্তু খেলা ছাড়বে কেন? এই অফিসিয়ালরা লাল-হলুদ জার্সিকে বেশি ভালবাসে, না আমরা? তোমার ফর্ম আছে, তবু মাঠ ছাড়বে? তাতে বাংলার ক্ষতি, ভারতের ক্ষতি। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবে কেন? ইস্টবেঙ্গলের প্রতি ভালবাসা আমারও অটুট। কিন্তু পরিস্থিতি আমায় মহমেডানে এনেছে। খেলা যদি ছেড়ে দাও, ক্লাবের প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও এসে দাঁড়াতে পারবেনা। মাঠ ছেড়োনা। কখনও যদি এমন দিন আসে, ইস্টবেঙ্গলের প্রয়োজনে তোমাকেই আমার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।'

একদিকে চরম অপমান, অন্যদিকে প্রকৃত সম্মান — তবু মহ-মেডানে যাবার সিদ্ধান্ত সুরজিৎ তখনই নিতে পারলনা। আগের কমিটির সম্পাদক ইসরার আমেদকে তাই বিশেষ আশার কথা শোনায়নি সুরজিৎ।

জানুয়ারির একুশ তারিখে পি কে ব্যানার্জী আমাকে বললেন, 'সুরজিৎ আমার সঙ্গে দেখা করছেনা কেন? দু'তিনজনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি। তুমি বলবে?'

বললাম সেদিন রাতেই: সুরজিৎ, তোমার অভিমান সঙ্গত কারণেই।' তবু প্রদীপদার সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি কোথায়? আমার অনুরোধ, দেখা করো।'

২৩ জানুয়ারী সকালে সুরজিৎ পি কে-র সঙ্গে দেখা করল। সঙ্গে চিন্ময়। পি কে বললেন, 'অফিসিয়ালদের কথা ভুলে যাও। তোমার আর আমার মাঝখানে আর কেউ থাকবে না। তোমাকে আমার প্রয়োজন। তুমি থাকো, দ্যাখো টীমটাকে কীভাবে তৈরি করি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমার আর চিন্ময়ের নেমন্তন্ন থাকল আমার বাড়িতে ২৬ জানুয়ারি দুপুরে, এসো কিন্তু।

২৭ জানুয়ারী বিকেলে ময়দানে এক মাঝারি ক্লাবের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলেন, 'সুরজিতের কী খবর? ইস্টবেঙ্গল রাখছে?' আমি বললাম, 'গতকাল পি কে-র বাড়িতে ওর নেমন্তন্ন ছিল। কী কথা হয়েছে এখনো জানিনা।' ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা নেমন্তন্ন নয়, ধরাধরি। ইস্টবেঙ্গলে থাকার জন্য ধরাধরি করছে সুরজিৎ।' একেবারে চমকে গেলাম দুটি কারণে। প্রথমত, সত্যি কথা বলা এবং সৎপথে চলার জন্য ময়দানে এই ভদ্রলোকের খ্যাতি আছে। বানিয়ে কিছু বলার লোক নন। দ্বিতীয়ত, ইস্টবেঙ্গলের এবারের দুই প্রধান রিক্রুটিং অফিসার জ্যোতিময় সেনগুপ্ত এবং অজয় শ্রীমানী এই ভদ্র-লোকের ব্যক্তিগত বন্ধু। অর্থাৎ, তিনি যা বললেন, সেটাই ঐ কর্মকর্তাদের কথা।



সুরজিৎ সেনগুপ্ত

দুরন্ত পরিকল্পনা করেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের আসল কর্মকর্তারা। যেহেতু পি কে-র শর্ত ছিল টীম গড়ায় তাঁর কথাই শেষ কথা এবং তিনি সুরজিৎকে দারুণভাবে চাইছিলেন — কর্মকর্তারা ওপর-ওপর সুরজিৎকে সাদরে রাখতে রাজী হলেন। কিন্তু ময়দানে সুক্ষ্মভাবে রটিয়ে দিলেন: সুরজিৎ ইস্টবেঙ্গলে থাকার জন্য 'ক্ষমা' চাইছে, 'ধরাধরি' করছে। শুধু ঐ মাঝারি ক্লাবের কর্মকর্তাই নন, কলকাতা টেস্টের প্রথম দিনে বিখ্যাত সাংবাদিক মতি নন্দী বললেন, তিনিও একটি সূত্র থেকে শুনেছেন, সুরজিৎ 'ধরাধরি' করছে। ইস্টবেঙ্গল-কর্মকর্তারা জানতেন এতে কাজ হবে। একদিকে পি কে-কে বোঝানো যাবে যে সুরজিৎকে রাখার আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে অভিমানী সুরজিৎ 'ধরাধরি'র কথা শুনে দূরে সরে যাবে।

পরদিন, অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারী সকালে সুরজিৎকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পরশু প্রদীপদার বাড়ি গিয়েছিলে?'

—"না।"

—"কেন?"

— "পঁচিশ আর ছাব্বিশ তারিখে নানা জায়গায় শুনলাম, আমি নাকি ইস্টবেঙ্গলে থাকার জন্য ধরাধরি করছি। আমি নাকি 'ক্ষমা' চেয়েছি। কেন ধরাধরি করব? কেন ক্ষমা চাইব? আমিতো কোনো অন্যায় করিনি। ক্ষমা চাওয়া উচিৎ কর্মকর্তাদের যারা, অন্যায়ভাবে দিল্টুকে তাড়িয়েছে, যারা গতবছর টানা অন্যায় করে গেছে, যারা এবার অন্যায়

অবশিষ্টাংশ ৩৬ পাতায় দেখুন

(উনিশশো বাটে যা, উনিশশো আশিতেও তাই। বিশ বছর আগে রোম অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক পি কে ব্যানার্জী এখনো সংবাদের শিরোনাম। যে কোনো চ্যালেঞ্জের সামনে অকুতোভয় পি কে বলেন: "যতোদিন পারব, ততোদিন লড়ব।" এই চিন্তিত তবু বদ্ধপরিকর পি কে-র সঙ্গে গত ২২ মার্চ 'খেলার কাগজ'-এর পক্ষ থেকে কথা বলেছেন অশোক দাশগুপ্ত।)



খেলার কাগজ: কনগ্র্যাচুলেশনস।

পি কে: কেন?

খেলার কাগজ: ইস্টবেঙ্গল টীম দুর্বল হওয়া সত্বেও পিছিয়ে যাননি, তাই।

পি কে: কথা যখন দিয়েছি, তা কি ফেরাতে পারি? শেষের দিকে মোহনবাগান ফেরানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু বড্ড দেরীতে।

খেলার কাগজ: এ কথা কি সত্যি যে গত চার বছরে চেয়েও আপনি ক্লাব মোহনবাগান পাননি?

পি কে: সত্যি।

খেলার কাগজ: দৈনিক পত্রে প্রকাশিত আপনার বিবৃতির এক জায়গায় আছে, 'আমি আশা করি পরিস্থিতি আবার আমাকে মোহনবাগানে ফিরিয়ে আনবে।' ইস্টবেঙ্গলে ঢোকার মুহূর্তেই মোহনবাগানে ফিরে যাবার আশা করার ব্যাপারটা কি অস্বাভাবিক নয়?

পি কে: মূল ইংরেজী বিবৃতি থেকে বাংলা অনুবাদে সম্ভবত বিভ্রাট ঘটেছে। আমি বলতে চেয়েছি, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি যদি আমাকে আবার মোহনবাগানে নিয়ে যায়, তখনও নিশ্চয় সদস্য-সমর্থকদের কাছ থেকে এখনি সহযোগিতা পাব। এবং যে সমস্যাগুলোর মুখে পড়েছি, সেগুলো থাকবে না।

খেলার কাগজ: সুরজিৎদের চলে যাওয়া সম্পর্কে কিছু বলবেন?

পি কে: তুমি ভাল করেই জানো, সুরজিৎকে আমি আন্তরিকভাবে চেয়েছি। আশা করেছিলাম, অন্তত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ-চিন্ময়রা থেকে যাবে। ওরা আমার কাজটাকে ভীষণ কঠিন করে দিয়ে গেল।

খেলার কাগজ: আপনার টীম কেমন হল?

পি কে: আপাতত অবশ্যই ভাল নয়। সুরজিৎরা সই করার দিনও ভেবেছি অন্তত চারজনকে টীমে পেলেও লড়া যাবে।

খেলার কাগজ: কোন চারজন?

পি কে: ভাস্কর, মনোরঞ্জন, প্রসূন এবং সাবির। যার একজনকে পাওয়া গেল। তবু কাজ শুরু করেছি। বলতে গেলে, গ্রাসরুট থেকে শুরু।

খেলার কাগজ: তিন ডিফেন্স কীভাবে সাজাবেন?

পি কে: মনোরঞ্জন আর সত্যজিৎ তো আছেই। সুধীরকে পিছনে খেলাব। প্র্যাকটিস করলে এখনো সুধীর দুর্ভেদ্য হতে পারে। আর একটা জায়গায় একজনকে সেট করতে হবে। সমর ভট্টাচার্যর মধ্যে খেলা আছে। নিজে বেশি দেখিনি, তবে শুনছি আমুজর ভাল ডিফেন্ডার।

খেলার কাগজ: মাঝ মাঠের কী হবে?

পি কে: আসল গণ্ডগোল তো এইখানে। কাজল আছে, আর একজন উইঙ্গারকে হয়তো নেওয়া হবে। হাবাকির জন্য চেষ্টা চলছে। হাবিবকে সেন্টার ব্যাক করে ফোর থ্রি থ্রি-তেও যেতে পারি।

খেলার কাগজ: প্রসূন এলনা কেন?

পি কে: ঝুঁকি নিতে হয়তো রাজী হলনা। একা এলে, হয় অনেক কিছু পেত, নয়তো অনেক কিছু হারাত। তবে আমি ওকে দলবদলের ব্যাপারে একটি কথাও বলিনি। যা বলার জ্যোতিষ্মবাবুরাই বলেছেন।

খেলার কাগজ: ফরোয়ার্ড লাইন কেমন দাঁড়াবে?

পি কে: মাঝখানে তপন দাসের ওপর অনেকটা ভরসা করতে হচ্ছে। তপনের মধ্যে খেলা আছে, কিন্তু ওর বড্ড ভয়। ভয়টা কাটাতে হবে। ভাল পা-টা দারুণ। গত বছর শুরু করেছিল ভাল। লোটাসের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটা গোল করল, অন্যায়ভাবে নাকচ হয়ে গেল। সব মিলিয়ে দুর্ভাগ্য, তাই দাঁড়াতে পারেনি। এবার ওর সামনে আবার বড় সুযোগ।

খেলার কাগজ: প্রথম টীমে বাকী দুজন ফরোয়ার্ড কারা হবে?

পি কে: ফার্স্ট টিম এখনই বলা কঠিন। তপনকেও সেট হতে হবে। হরজিন্দার আর সুভাষ ভাদ্রকে দু'দিক দিয়ে কাজে লাগানো যায়। সামনের তিনজনের মধ্যে দুজন স্ট্রাইকার হয়ে যেতে পারে। জলিফুদ্দিন আর বিভাস সরকারও নজরে থাকবে। পায়ের জন্য চেষ্টা করতে সেহাবুদ্দি কোক গেছে। ফিটনেস আনতে পারলে সুভাষ ভৌমিকের কথাও মাথায় থাকবে। মোট কথা, কেতারেশন কাপটো বটেই, টীমের কয়েকটা ম্যাচ না গেলে, ফরোয়ার্ড লাইন সেট হবে না।

খেলার কাগজ: প্র্যাকটিস শুরু করেছেন?

পি কে: এখুন তারিখ মাঠে নেমেছি। সকাল আর আর তধু তপন, মনোরঞ্জন আর সত্যজিৎ ট্রেনিং করেছে।

খেলার কাগজ: বাকীরা কোথায়?

পি কে: আস্তে আস্তে আসবে। জলিফুদ্দিন সই করে বাড়ি গেছে। হাবিব আকবরকে আনতে গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি।

খেলার কাগজ: হাঁ, আকবরকে ইস্টবেঙ্গল পেলনা কেন?

পি কে: রহস্যময় সব ব্যাপার ঘটছে। এবার মহমেডানের সেই তৎপরতাটা দারুণ ছিল। আকবরকে আনতে গিয়ে হাবিব শুনল, আগের দিনই মহমেডান ওকে তুলে নিয়ে গেছে। বুধিবার ট্রাক করে পাকা কথা বলে ইস্টবেঙ্গলের এক কর্মকর্তা সোমবার ফেরত গেলেন। তিনিও চোখ উঠেই জানাল, "মহমেডানে খেলব।" অমলরাজও হাতছাড়া হয়ে গেল। যাকগে, এসব ভেবে আর লাভ নেই।

খেলার কাগজ: এই টীম নিয়ে কতটা সাফল্য আশা করেন?

পি কে: তাড়াতাড়ি কোনো মিরাকল আশা করা ভুল হবে। তবে, ছেলেরা ঠিক মতো পরিশ্রম করলে এবং ইস্টবেঙ্গল জনতা টীম সেট করার জন্য ধৈর্য ধরলে এবং সময় দিলে, কিছুটা আরো নিশ্চয় দেখাতে পারব।

অমল দত্তর কলম

উনিশশো আশির চিন্তা, সম্ভাবনা

জানুয়ারীর যে রাতগুলো হাই-হাই শীতের আমেজ বহন করছিল, সেই রকম এক রাতে যাদবপুর অঞ্চলের সন্তোষপুর (অমিত বাগচীর বাড়ি থেকে বাগুইহাটির নিজের বাড়ী ফেরার সময় নিজেকেই একবার আচমকা প্রশ্ন করে বসেছিলাম—'আমি কী সেই অমল দত্ত!' নেহাৎই ছেলেমানুষী প্রশ্ন। আসলে নিজেকে নিয়ে তেমন করে কোনদিন ভাবি নি। বহুল কষ্টে গড়ে তোলা স্বপ্ন এবং ভালোবাসার ইমারতগুলো নিজের চোখেই দেখেছি নিয়ম-বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্রে ভেঙে পড়তে। তবুও মুহূর্তের টানাপোড়েনে নিজেকে নিয়ে নিজের ভিতরে অনেক কিছুই প্রশ্নের ভিড় জমায়, তাই স্বগতোক্তি করেছিলাম একটি কারণে। ইউরোপীয়ান কোচদের যে ভূমিকা—টীম-গড়ার ক্ষেত্রে কোচের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া আমিও সেই মূল্য পেতে শুরু করেছি। বলা যায়, নিজেকে বা নিজের আদর্শকে আমি অংশত প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। মহমেডান ক্লাব তাদের টীম তৈরীর কাজে আমাকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়েছে।

যে স্বপ্নকে উনিশশো ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সালে লাল-হলুদের শিবিরে বসে খানিকটা বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেই স্বপ্ন এই আশীর দশকের গোড়াতে আবার আমার কাছে মর্যাদার সঙ্গে ফিরে এসেছে।

আমার মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ভাস্কর, চিন্ময়, প্রশান্ত, মনোরঞ্জন, শ্যামল, মিহিরকে টীমে নিয়েছিলাম সেই দৃষ্টিতেই। সাতাত্তরে ইস্টবেঙ্গলের ঘরে কীর্তি-সম্মান ছাড়া আর কিছু দিতে পারিনি বলে দুঃখ ছিল না। কারণ, আমি পরীক্ষায় সফল হয়েছিলাম ওদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে।

উনসত্তরে কীর্তি-পীঠ পাবার পর, সত্তর সালে মোহনবাগান ক্লাব হাবিব, নঈমকে ছেড়ে দিল আমাকে না জানিয়েই। কোচের ভূমিকা শুধু প্র্যাকটিস বা খেলা চলাকালীন ক' ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, টীম তৈরীর প্রথম পর্ব থেকে মরশুমের শেষ সময় পর্যন্ত কোচের দায়িত্ব বা গুরুত্ব সবার চেয়ে বেশী।

মহমেডান ক্লাবের শতবার্ষিক কর্মকর্তারা সেই সারমর্মটা বুঝেছিলেন, বর্তমান কমিটি তারা কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে আমাকেই একমাত্র অবলম্বন করলেন। আমার পরামর্শে যে জায়গায় যাকে নেওয়া দরকার—নিলেন। গত বছর আমার কিছুই করার ছিল না, দু পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ভার যখন আমার ওপর দেওয়া হল তখন বড় বড় সব ফাঁক পূরণে আমি একান্ত অপারগ। অনেক স্বপ্ন সে তো মরুভূমিতে জলপ্রপাত দেখার মতো। আমি শুধু চেষ্টায় ছিলাম, ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কাছ থেকে একটি পয়েন্ট কৌশলে ছিনিয়ে নেওয়া।

আমি কতটা কী পেয়েছি সেই ফলাফল উনআশীর মরশুমের ফুটবল-পাণ্ডুলিপিতে কার্বন কপির মতো প্রায় অবস্থা হয়ে আছে। তাই, আশী সালের মহমেডান নিয়ে আমার মতো চিন্তা ভাবনা। কোনো মিলিয়ার সর্দারের পর্দায় ঘর পার করে আমি বলতে চাই না, 'কীর্তি দেবই।' হয়তো মহমেডান টীম ভালো হয়েছে, কিন্তু কে কেমন ফর্মে থাকবে—খেলার আগে কেমন করে বলতে পারি। আমি বরাবরই লড়াই করার পক্ষপাতী। সমুদ্রের কোন্ ঢেউটা পাড়ে এসে বিরাট আকার নেবে, তা কেউ সমুদ্রের চেহারা দেখে বলতে পারে?

তবে, এতদিন যে মহমেডান 'তিন-প্রধানের' মধ্যে থেকেও 'অপ্রধান' হয়েই ছিল, আজ সেই ক্লাব পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছে। এখনো যাঁরা বলছেন, যাই টীম করুক, তাঁরা কিন্তু তিন নম্বরে — তাঁরা একটু আস্তে কথা বলুন। সিদ্ধান্তে আসার আগে কয়েকটি মাস অপেক্ষা করুন।

ছিয়াত্তর-সাতাত্তরে যাদের আমি হাতে পেয়েছিলাম ইস্টবেঙ্গলে, তাদের সাত জনকেই এখানে পেয়েছি—মিন্টু, সুরজিৎ, শ্যামল, ভাস্কর চিন্ময়, প্রশান্ত ও হাবিব। এদের সম্ভাবনা আমার জানা আছে। তাছাড়া সাবির, ডেভিডের সঙ্গে ওদের বোঝাপড়াও হয়েছে। ফলে, মোটামুটি একটা চালু টীম হাতে পেয়েছি।

অনেকে বলছেন, গত বছরের ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা হয়েছে এবার মহমেডানের—প্রচুর ফেরাব। আসলে আমাদের বক্তব্যগুলো এত তাৎক্ষণিক যে, মন্তব্যে বিচারবুদ্ধি কখনোই স্থান পায় না। আমার টীমে সব জায়গায় একজন করে অতিরিক্ত খেলোয়াড় আছে। একমাত্র স্ট্রাইকারের জায়গায় বেশি খেলোয়াড়। গতবছর আকবরের পায়ে চোট থাকায় টীমের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই টীমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ঐ স্ট্রাইকারে আমি চারজন রেখেছি। পৃথিবীর কোনো দেশে সাতাশটা টীম নিয়ে লীগ খেলা হয় না। এই কলকাতায় সেটাই হতে চলেছে। সুতরাং বাকিগুলো মাঠে খেলার জন্য চার-স্ট্রাইকার প্রয়োজনের বেশী নয়। আর, এই প্রয়োজন আমিই সবচেয়ে ভাল বুঝেছি, বুঝব। আজ থেকে মাস ছয়েক পরে কী জানি আমার ভাগ্যে কী থাকবে। বাগুইহাটির বাড়ীর পথে মাঠিতে হাঁটতে হয়ত অনুভব করবো অদ্ভুত এক আনন্দ অথবা দুঃখ। আমার জীবনটা এই ভাবেই তৈরী—সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। থাকব।



এই অবস্থায় মহমেডান কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রসূন, সুরজিৎ ও হাবিব।

প্রি-অলিম্পিকে – অন্য ভূমিকায়

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

প্রি-অলিম্পিক ফুটবল চলার সময়ে হঠাৎ সিঙ্গাপুরে আমাকে দেখে ভারতীয় ফুটবলাররা একপ্রস্থ অবাক হয়ে গেল। অবাক হবার পর খুশী হওয়াই পালা। বাংলার ছেলেরা আরও খুশী হল যখন শুনল যে প্রি-অলিম্পিক ফুটবল সম্পর্কে লেখার দায়িত্ব নিয়েও আমি গিয়েছি। দুইদিনই মাঠে যেতাম খেলোয়াড়দের সঙ্গে একই বাসে। ছিলাম একই হোটেলে। ফুটবলারদের মধ্যে অন্য ভূমিকায় থাকতে প্রথমে খুবই লাগছিল, কিন্তু মাঠে নামতে না পারার দুঃখ পরের দিকে বড় বেশী ধাক্কা দিচ্ছিল। অবশ্য স্থানীয়া মাঠে প্র্যাকটিস রোজই করেছি।

চীন-১ ভারত-০

চীনের কাছে ভারত ৭-১ গোলে হেরেছিল ১৯৭৪ সালে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে। এবার কিন্তু ভারত দারুণ লড়ল। গোলে ব্রুনো ছিল ভাস্কর, অন্য ডিপ ডিফেন্ডাররাও খুব লড়ল, কিন্তু একেবারে শেষের দিকে ভারতের দুর্গের পতন হল। আকস্মিকভাবে কম্পটন দত্তের বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন রেফারী। ভারত হারল, কিন্তু পরের ম্যাচগুলোর তুমুল সংগ্রাম করার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে রাখল।

সিঙ্গাপুর-১ ভারত-০

যে টীম চীনের সঙ্গে প্রায় ড্র করেছে, সে টীমের সিঙ্গাপুরের সঙ্গে হারার কোনো যুক্তি ছিল না। তবে, পরে দেখা গেল রেফারীর সাহায্য নিয়ে সিঙ্গাপুর ইরাণ ছাড়া অন্য সব টীমকে হারিয়ে দিয়েছে। ইরাণ এত ভাল টীম যে রেফারীর হাজার অবিচার সত্ত্বেও সাইনাকে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে দেয় ৮-০ গোলে। যাই হোক সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হারার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামগ্রিক সাফল্যের সম্ভাবনা চলে যায়। এই দিনও ভাস্কর, শ্যামল আর মনোরঞ্জন খুব ভাল খেলল। আহত থাকায় প্রথম ম্যাচে শ্যামল মাঠে নামতে পারেনি, দ্বিতীয় ম্যাচে টীমে ফিরে এসে নিজের উপস্থিতি ভাল ভাবেই টের পাইয়ে দেয়। কিন্তু মাঝমাঠে আক্রমণ গড়ার ব্যাপারে সক্রিয় হতে না পারায় ভারতকে পরপর দুটি ম্যাচে হারতে হয়।

ভারত ৪ : শ্রীলঙ্কা ০

খেলার শুরুতেই অন্তের বেগে আক্রমণ করে ভারত। বাঁ দিক থেকে সাবিরের সেন্টার মানসের পায়ে পড়ে, কিন্তু মানসের শট বার উঁচিয়ে বাইরে যায়। সাবিরের পাস থেকে বল পায় পায়াস, কিন্তু পায়াসের শট রুখে দেয় শ্রীলঙ্কার গোলকীপার। প্রসূনের শটও আরের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একের পর এক আক্রমণে শ্রীলঙ্কার রক্ষণভাগ তছনছ হয়ে যায়। মানসের কর্ণার কিক থেকে মনোরঞ্জন এমন একটি শট নেয়, যাকে বলতে পারি আন্তর্জাতিক মানের শট। কিন্তু বল ক্রশপিসে লেগে ফিরে আসে।

প্রথম গোল করে সাবির। শ্যামল থেকে পারমিন্দার, পারমিন্দার থেকে প্রসূন, প্রসূন থেকে সাবির — কোণাকুনি শটে চমৎকার গোল। দ্বিতীয় গোল করল পায়াস। সত্যিই দারুণ গোল। প্রসূনের কাছ থেকে বল পেয়ে পারমিন্দার বল বাড়ায় সাবিরের দিকে। সাবির পায়াসকে দেয়। পায়াস কয়েক পা মনোরম



ভঙ্গীতে এগিয়ে বল গোলে প্লেস করে। তৃতীয় গোলটি পায়াস ও সাবিরের সম্মিলিত প্রতিভার ফসল। সুন্দরভাবে বল তুলে দিয়েছিল সাবির, চোখ ধাঁধানো ভলিতে গোল করে যায় পায়াস। চতুর্থ গোলটি সাবির যেভাবে করে, তার সঙ্গে কলকাতার দর্শকরা পরিচিত। মানসের কর্ণার-এর সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে ভারতের পক্ষে চতুর্থ গোল করে সাবির।

ইরান ২ : ভারত ০

কোন সন্দেহ নেই ইরান এখন প্রায় ইওরোপীয় মানের ফুটবল খেলে। খেলার শুরুতেই ভারতকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেটিয়ের মতো আক্রমণ চালাল ইরান। কিন্তু ভাস্কর অতো সহজে হার মানতে রাজী ছিলনা। সেদিন গোটা টীমই এইদিন প্রাণপণ খেলল। অধিনায়ক প্রসূন যেন নিজের সর্বতোরকম দক্ষতা এই ম্যাচটির জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। মনোরঞ্জন, পারমার আর শ্যামল ডিপ ডিফেন্সকে যথাসাধ্য মজবুত রাখার চেষ্টা করেছে। হাফ টাইম পর্যন্ত কোনো গোল হয়নি। খেলা শেষ হওয়ার এগারো মিনিট আগে ইরান প্রথম গোল করল। সানজারি চমৎকারভাবে বল পেয়ে উঠে এসে ভাস্করকে গোল লাইন থেকে সামান্য টেনে আনে। তারপর নিখুঁত ব্যাক পাশ এবং নিখুঁত গোল। লেফট উইংগার আমিলুত্তি একক নৈপুণ্যে এগিয়ে দুর্ধর্ষ শট নেয়, বল পোস্টে লেগে গোলে ঢোকে। ভাস্করের কিছু করার ছিলনা। সেখানে পিঠ দিয়ে সত্যিই ভারতীয় ডিফেন্ডাররা কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। যে সানজারি গতবার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে খেলতে এসেছিল, তাকে দেখলাম ইরানের পক্ষে সুইপারের ভূমিকায়।

উত্তর কোরিয়া ২ : ভারত ১

শেষ ম্যাচে আহত দেবরাজ কুমারের জায়গায় ব্যাক লাইনে ফিরে এলো। কুমার অবশ্য টীমে থাকল মানসের জায়গায়। দেওয়া নেওয়া করে এদিন ভালই খেলছিল ভারত। অনবদ্য খেলল মনোরঞ্জন। কিন্তু প্রথমার্ধেই এক গোলে এগিয়ে গেল কোরিয়া। উইংগার উঁচু পারমারকে কাটিয়ে গোলে শট নেয়। মনোরঞ্জনের পায়ে লেগে বল সামান্য ঘুরে গোলে ঢোকে। ভাস্করের কিছু করার ছিলনা। ৩১ মিনিটে এই গোল হওয়ার পর ৪৬ মিনিটে গোল শোধ করে ভারত। প্রসূন নিখুঁতভাবে বল এগিয়ে দেয় সদা তৎপর পায়াসের দিকে। দর্শনীয় ভলিতে গোল করে পায়াস। কিন্তু খেলা শেষের তিন মিনিট আগে কোরিয়া ম্যাচ তাদের করায়ত্ত করে নেয়। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে উকের পা থেকেই আসে দ্বিতীয় গোল।

কে কেমন খেলল

ভাস্করকে যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। এমনিতে ওর সামনে কখনো প্রশংসা করিনি। তাই বলি, এখনও অনেক কিছু শেখার আছে, তরুণ বসুর কাছাকাছি পৌঁছতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমি তরুণ বসুর বড় ফ্যান। কিন্তু এশিয়ান গেমস আর প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে ভাস্করের খেলা দেখে মনে হচ্ছে, শিষ্য বোধ হয় গুরুকেও ছাড়িয়ে গেল। আমি জানি ভাস্করের এই সাফল্যে সবচেয়ে বেশী খুশি হবে স্বয়ং তরুণ বসু। এবার সিঙ্গাপুরে কতবার যে ভাস্কর ভারতের নিশ্চিত পতন রুখে দিয়েছে তা গোনার চেষ্টাও কেউ আর করেনি।

ডিপ-ডিফেন্সে এক নম্বর খেলোয়াড় যদি মনোরঞ্জন হয়, দু-নম্বর অবশ্যই শ্যামল। মনোরঞ্জন এই প্রথম ভারতের সিনিয়র টীমে খেলল। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবকে প্রতিভা ও দৃঢ়তা দিয়ে মুছে দিয়েছে এই অদম্য সাহসী

(শেষাংশ ১০ পাতায় দেখুন)

সত্যজিৎ কী বলছে

সরোজ চক্রবর্তী

একটা ভাঙা সাম্রাজ্য ওর হাতে তুলে দিয়ে বলা হল, 'যাও, লড়াই করো। তোমার সামনে দুটো বড় সাম্রাজ্য রয়েছে।' তোমার সামনে চব্বিশটি দ্বীপ রয়েছে। যাও, জীবন মরণ সংগ্রাম করে ওদের গুড়িয়ে দাও। তোমার সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার ওপর। তুমি কী পারো না, একবার অন্তত দেখিয়ে দিতে—তুমি কোন সাম্রাজ্যের সেনাপতি।'

সেনাপতি হাসলেন মনে মনে। যাত্রার চণ্ড রাজার সংলাপগুলো সেনাপতিকে মোটেই উজ্জীবিত করতে পারলো না। কারণ, সেনাপতি জানেন, তাকে দেওয়া হয়েছে পুরানো প্রস্তর যুগের মূল্যবান কয়েকটি মারণাস্ত্র। কিন্তু সেই অস্ত্রে আগের মতো ধার নেই।

সেনাপতি ভালো করেই জানেন, তাকে দেওয়া হয়েছে—কুয়াসার পাহাড় ভাঙার মতো কয়েকটি ঢাল-তরোয়াল। সেনাপতি ভালো ভাবেই বুঝলেন, সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ করে 'যুদ্ধং দেহি' বলে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করার সেই নায়ক 'অভিমন্যু' এই সাম্রাজ্যে নেই।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রাজা এবং তাঁর পরিষদেরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সেনাপতির অভিষেক ঘটালেন। যুদ্ধের প্রায় দু মাস আগে সেনাপতি বুঝে গেলেন—কুরুক্ষেত্রে লড়াই করতে যাওয়া নিরর্থক।—

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে

নেতাজী সুভাষ রোডে ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার অফিসের ঘড়িতে এগারটা পঁয়ত্রিশ। মিহির বসু বললো, "সত্যজিৎ এখনই আসবে, বসুন।" টেবিল ঘিরে পাশাপাশি চেয়ারগুলোতে এক এক করে তপন দাস, অশোক চন্দ ও কাজল চ্যাটার্জী এসে বসলো। অশোক বললো, "কী করবো বলুন তো। উয়াড়ি আসছে। কিন্তু এখনো ঠিক করতে পারছি না যাবো কিনা। ইস্টবেঙ্গল আমায় আর রাখবে না মনে হচ্ছে।" সিনেমা শুরুর আগে অনেক সময় বন্ধুদের মধ্যে যেমন সিনেমার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় অথবা নায়ক-নায়িকা বা পরিচালকের গুণাগুণ নিয়ে বিতর্ক হয়, তেমনি সত্যজিৎ আবির্ভাবের আগে 'আগামী ইস্টবেঙ্গল' বিষয়ে চলে যাচ্ছিলাম ওদের সঙ্গে।

তপন বললো, "মোহনবাগান ছাড়ছি। কেন জানি না মোহনবাগান সমর্থকরা আমাকে কিছুতেই নিতে পারলো না। তাই ভাবছি, ইস্টবেঙ্গল ডাকলে চোখ বুজে চলে যাবো।" কাজল বললো, "গতকালই ইস্টবেঙ্গল কথা বলেছে। প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম, হয়ত আমায় রাখবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাকে রাখার উৎসাহ দেখালেন ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা।"

বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে সত্যজিৎ মিত্র অফিসে এল। গায়ে নাইলনের নীল গেঞ্জি। টেবিলের কাছাকাছি আসতেই তপন একটু চিৎকার করে বলে উঠলো, "ক্যাপটেন আসছে।" সত্যজিৎ একটুও হাসলো না। বিবাহের পূর্বমুহূর্তে বরবাবুটি যেমন নার্ভাস হয়ে সামিয়ানার নিচে হাঁটু গাড়ে, তেমনি সত্যজিৎও ভেতরে ভেতরে অন্য এক অস্থিরতা নিয়ে নিজের জায়গাটাতে গিয়ে বসলো। খাতায় সই করলো।

সত্যজিৎ : "কিছুদিন আগে ইস্টবেঙ্গলের এক কর্মকর্তা আমার বাড়ীতে এলেন। আমার সঙ্গে পাকাপাকি কথা বলতে চাইলেন। বললাম আগে সুরজিৎদার কাছে যান, কথা বলুন, তারপর আমার কাছে আসবেন, আমি তো আছিই। ওরা বললেন, সুরজিৎতো থাকছেই। কিন্তু আমরা মিহির প্রশান্তকে রাখবো না। আমি বললাম, টীমের স্বার্থে এবছর সবাইকে রাখুন। আমরা এই টীম নিয়ে লড়বো। প্রদীপদা আছেন। লীগ আমরা পাবোই। ওদের কথার হাবভাবে বুঝলাম, টীমের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনায় উৎসাহী নন। তা ছাড়া আমিও কখনো ভাবি নি, ক্যাপটেন হয়েছি বলেই আমার পরামর্শে টীম করতে হবে। কারণ, আমি জানতাম, যেখানে প্রদীপদা, সুরজিৎদা রয়েছেন, সেখানে টীমের ভালো মন্দ ওরাই বুঝবেন। ফলে, আমি কোনো ব্যাপারেই কারোর সঙ্গে মতান্তর করি নি। শুধু বলেছিলাম, মিহির প্রশান্তকে ছাড়বেন না।"



সত্যজিৎ পিছনে মনোরঞ্জন

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে

"শনিবার প্রশান্তর সঙ্গে দেখা হতেই ও জানালো, 'আমরা মহমেডানে যাচ্ছি। ২২ তারিখ সব পাকা কথা হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর মামা, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমার সঙ্গে তো কথাই বললো না। সুরজিৎদার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছে। আমরা অনেক ভেবেচিন্তেই এই সিদ্ধান্ত নিলাম।' মামা শুরুকে সত্যজিৎ কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। অফিসের খটাখট টাইপ মেশিনের শব্দেও ওর কথা স্পষ্ট শুনছিলাম, "এখন বলছেন সব খেলোয়াড়ের কাছে আমায় যেতে। গিয়ে কী করবো। গত ১৮ তারিখও সুরজিৎদা-চিন্ময় আমার অফিসে এসে বলে গেলো, 'আমরা থাকছি। তোর কোনো চিন্তা নেই।' শুনে আমি নিঃশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে শুনলাম, যেদিন ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা সেদিন কোনো কর্মকর্তা ওদের সাথে দেখা করেন নি, অথচ কেউ আমায় এসে ব্যাপারটা জানাবার প্রয়োজনও মনে করেন নি। যদি কর্মকর্তারা এসে বলতেন সুরজিৎদারা থাকছেন না, তাহলে আমি অন্তত ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেতাম কেন যাচ্ছ।' কিন্তু যখন জানলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। কারোর কাছে গিয়ে আর লাভ হবে না।

একদিন নিশীথদার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এক কর্মকর্তা। ফেরার পথে হঠাৎ তিনি বললেন, 'চলো, তোমাকে নিয়ে একবার ডেভিডের কাছে যাই।' আমি বললাম 'ডেভিডের সঙ্গে আমি কিন্তু কথা বলবো না, আমি গাড়ীতেই বসে থাকবো, আপনি কথা বলতে যাবেন।'

কর্মকর্তাটি তাতেই রাজী হলেন। বুঝলাম, যখন কোনো চেষ্টাতেই সুরজিৎদাদের ফেরানো যাবে না তখন ক্লাব আমাকে ওদের কাছে পাঠাতে চাইছেন।'

সত্যজিৎ ক্ষুব্ধ। কিন্তু সেই ভাবটা ও বুঝতে দিতে চায় না। তাই কথা বলার ফাঁকে মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকায়, হাত নাড়ে — অস্থিরতার যা যা লক্ষণ।

সত্যজিৎ চিন্তিত। কিন্তু কখনোই গলা বাড়িয়ে বলতে চায়না — যারা চলে যাচ্ছে তারা অন্যায় করছে। তাই, উনা একঘণ্টা নানান কথার মধ্যে সুরজিৎ, চিন্ময়, শ্যামল, প্রশান্ত,

তেজিত প্রসঙ্গ চলে আসছে।

সত্যজিতের আশা, 'হয়ত সাবির, ভাস্কর, মনোরঞ্জন থাকবে। মিহিরকে ক্লাব রাখছে, মিহিরও থাকবে।'

১৫ মার্চ—১৫ নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে

দরজা সামান্য ফাক করে দুর্গাদাস মিত্র হেট্টু করে বললেন, 'সত্যজিৎ বাড়ীতে নেই।'

—'কোথায় গেছে জানেন।'

—'শুনেছি কোনো এক প্লেয়ারের জন্য ওকে হোটেলে থাকতে হয়েছে গত রাত্রি থেকে। এর বেশী আর কিছু জানি না।'

সকাল সাড়ে আটটায় সত্যজিতের বাড়ীর সামনে সামান্য জটলা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল অনুরাগীদের। সত্যজিতের বাবা দুর্গাদাস মিত্র ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন ওদের দিকে। কিছুদিন আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি ছোট ছেলের খেলার খবর সেই আগের মতো তিনি রাখেন না।

—'আগে জিজ্ঞেস করতাম কী করছিস না করছিস। কিন্তু এখন ও বড় হয়েছে, নিজের ভালো মন্দ চিন্তা করার বুদ্ধি হয়েছে, তাই এখন কিছু ভাবি না।' দুর্গাদাসবাবুর স্বর নরম ছিল। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ভালো জায়গায়। পাঁচ ছেলের জন্য তাঁর আর কোনো ভাবনা নেই। সবাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই সঙ্গে সত্যজিতের দীর্ঘ দিনের সাধনা ও পরিশ্রম থেকে মিত্র পরিবারের কথা সবাই জেনে গেছেন। দুর্গাদাসবাবুর সুখ-শান্তি চাইতেই।

২০ মার্চ—সত্যজিতের সঙ্গে

দলবদলের প্রাথমিক ধাক্কাটা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা সহ্য করে নিলেও নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটের মোড়ে যারা বসে ছিল তারা কিন্তু পাড়ার-ছেলে সত্যজিতের অবস্থাটা বেশী করে অনুভব করছিল। সত্যজিতের বাড়ীর সামনের রকটাতে বসে টেন-টুয়েলভ ক্লাসের ছেলেগুলি যা যা আলোচনা করছিল, সে সব কথা ওর ড্রইং রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল।

সত্যজিৎ দাঁড়ি কামিয়ে গাল পরিষ্কার করে আমার সামনে এসে বসলো। এ ক'দিনের পরিশ্রম কিংবা চিন্তায় ও যেন একটু ক্লান্ত।

—'বাবার মুখে শুনলাম, একদিন এসেছিলে। তার আগের দিন রাত্রে মনোরঞ্জনের সঙ্গে থাকতে হয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনা ইস্টবেঙ্গলে থেকে গেছে।

প্রিজ, তুমি একটু বোসো। এখনিই বেরুবো অফিসে। সত্যজিৎ ভিতরের ঘরে চলে গেল।

ট্যাক্সি যখন রেস কোর্সের পা ধরে ছুটতে শুরু করেছে সত্যজিৎ তখনো চুপ। কিছুক্ষণ পরে —'শেষ মুহূর্তে আমার তরফ থেকে যার যার সঙ্গে দেখা করা উচিৎ তাদের সঙ্গে করেছি। মাদ্রাসে পর্যন্ত গিয়েছিলাম সাবির-ভাস্করের জন্য। ভেবেছিলাম, ওরা হয়ত ক্লাবে থেকে যাবে। আমি কাউকে জোর করিনি, শুধু বলেছিলাম, তোমাদের যদি ক্ষতি না হয়, তাহলে থেকে যাও। মাদ্রাজ এয়ার পোর্টে ওরা দুজন বললো, 'আমরা পরে জানাবো।' আমি জানতাম, এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলে থাকা ওদের পক্ষে অসম্ভব। আমি এখন আর কিছু ভাবছি না, যা হবার হবে।"

অফিসে পৌঁছে সত্যজিৎ খোঁজ করলো মনোরঞ্জনের, তপন এসে জানিয়ে গেল, 'আসে নি'। সত্যজিৎ আবার ফিরে গেল সেই প্রসঙ্গে। কমকর্তাদের ব্যাপার-স্যাপারে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ, টীম করার জন্য ওঁদের কোনো দরকারই ছিল না। "আমাদের ওপর প্রথম থেকেই ভার দিয়ে দেওয়া হলে আমরাই টীম করতে পারতাম। কর্মকর্তাদের ব্যবহারে প্রায় সব প্লেয়ার যখন রেগে আছে তখন প্লেয়ারদের কাছে ওঁদের যাওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু এখন আর এসব কথা বলে কী হবে। এতে আবার একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। শুধু দুঃখ হয়, আজ ইস্টবেঙ্গল টীমের এই অবস্থার জন্য সুরজিতদাদের একমাত্র দোষী করা হচ্ছে। আমি ভালো করেই জানি, ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যেতে সুরজিতদাদের মন একটুও চায়নি। বাধ্য হয়েছে ছেড়ে যেতে! আমি ক্যাপটেন বলে শুধু নিজের কথা ভাবতে গিয়ে ওদের দোষ দেবো — এ হতে পারে না।'

কথার মাঝখানে হঠাৎ চিন্ময়ের আবির্ভাব। দেখা করতে এসেছে মনোরঞ্জন-সত্যজিতের সঙ্গে। সত্যজিৎ ওকে পাশে বসালো।

সত্যজিৎ : কী রে কেমন আছিস ?

চিন্ময় : মোটেই ভালো নয়।

সত্যজিৎ : কেন রে ?

চিন্ময় : মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। বাড়ীতে কেউ ভালো ভাবে কথা পর্যন্ত বলছে না। তুই-ই বল না, ইস্টবেঙ্গল আমার ধ্যান, আমার রক্ত, কিন্তু কী করবো? আমি তো থাকতে চেয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে কথা হওয়ার পরও ক্লাব পরে আর দেখাই করলো না। এই সব অফিসিয়াল ক্লাবের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। সামনের বছর আমার ক্যাপটেন-শীপটাও চলে গেল। এই দুঃখ কেউ বুঝবে না আমি ছাড়া।

কে যেন পাশ থেকে আচমকা প্রশ্ন করলো, 'ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের খেলা হলে আপনি তখন কী করবেন ?'

চিন্ময় গম্ভীর ভাবে ফিরে তাকালো লোকটির দিকে। বললো, 'মহমেডানের জার্সি আমি যখন গায়ে পড়েছি তখন ওই টীমের হয়ে আপ্রাণ লড়াই করবো। তখন আমার টীম কিন্তু ইস্টবেঙ্গল নয়—মহমেডান। তবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলায় আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। আগেও ছিলাম, এখনও আছি।'

আমার প্রশ্ন, 'এখন ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখবেন ?'

চিন্ময় : নিশ্চয়। একটাকা দামের গ্যালারীতে বসে খেলাদেখবো।

সত্যজিৎ : তা কেন করবি, বরং আমি তোকে প্লেয়ারস-গেস্ট কার্ড দেবো।

চিন্ময় : মেম্বারশীপ গ্যালারীতে বসে খেলা দেখবো না।

ইতিমধ্যে খবর এলো মনোরঞ্জন অফিসে এসে গেছে। আলোচনার টেবিল পরিবর্তন হল।

মনোরঞ্জন বললো, "চিন্ময়কে খাওয়াবো বলে আমিই অফিসে ডেকে এনেছি। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

সত্যজিৎ বললো, "আমার কিন্তু একটা জরুরী কাজ আছে। আমি পার্ক স্ট্রীটে নেমে যাবো।" চিন্ময় জোর করল। ট্যাক্সি পার্ক স্ট্রীটে আসতেই সত্যজিৎ নেমে গেল।

'পিপিং' রেস্টুরেন্টে গোল টেবিল ঘিরে আমি মনোরঞ্জন, চিন্ময় এবং আমার এক সাংবাদিক বন্ধু। অর্ডার দিল মনোরঞ্জন।

মনোরঞ্জন : শুনলাম, সুরজিৎদা আমাকে মহমেডানে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করেছিলেন, এটা একেবারেই বাজে কথা। আমরা কী বাচ্চা যে আমাদের জোর করলেই চলে যাবো। আমরা যে যেখানে গেছি বা আছি—সব নিজেদের ইচ্ছাতেই।

আধ ঘণ্টা ধরে খাওয়ার টেবিলে ইস্টবেঙ্গল টীম নিয়ে আর কেউ কোনো আলোচনা করেনি।

২১ মার্চ : ইস্টবেঙ্গল টেন্টে

জনা তিরিশ উৎসাহী টেন্টের চারিদিকে ভীড় করেছে। আজ থেকে ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে ওয়াই এম সি এ মাঠে। উপস্থিতি সংখ্যা তিন—সত্যজিৎ, মনোরঞ্জন ও তপন দাস। এক উঠতি কর্মকর্তা বললেন, "কোনো কর্মকর্তা ভয়ে ক্লাবে আসতে চাইছেন না। টীমের এই অবস্থার জন্য জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ও অজয় শ্রীমানীরাই দায়ী। এখন ওঁরা গা বাঁচাচ্ছেন। ভাবতে পারেন, ইস্টবেঙ্গল টীমে

একটা হাফ পাওয়া যাচ্ছে না। নিশীথদা প্রচণ্ড রেগে আছেন ওঁদের ওপর। যাঁরা প্লেয়ারদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে জানেন না, তাঁরা কেন টীমের দায়িত্ব নেন?"

টেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে তরুণ কর্মকর্তাটি রাগে কাঁপতে লাগলেন।

টেন্টের ভিতরটা যেন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছিল। অফিসের বেলা থাকলে দু-তিনজন খেলোয়াড় যেমন টেন্টে এসে ড্রেস করে যায়—সত্যজিৎদের দেখে তাই মনে হচ্ছিলো। ইস্টবেঙ্গল টেন্টের সেই জমজমাট পরিবেশ আর নেই। যেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মানবিয়োগ ঘটেছে। সকাল থেকে সবাই বেরিয়েছে। অমলেই টুকরো করে কেউ বুকের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে সত্যজিৎ একটু থেমে পড়লো। বললো, "এখনো ঠিক প্ল্যান পাচ্ছি না।" ওরা তিনজনই চুপচাপ।

সাড়ে দশটায় টেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি আর সত্যজিৎ। কোনো সমর্থকই এগিয়ে দিল না অটোগ্রাফের খাতা। কোনো সমর্থকই পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলো না, 'গুরু এবার কিন্তু মোহনবাগান-মহমেডানকে হারানো চাই।

সত্যজিৎ বললো, "সত্যকাম বাবু প্রতীপদা জানালেন আজ থেকে প্র্যাকটিস। দু-একদিনের মধ্যে সবাই চলে আসবে।"

সত্যজিৎ কেন ইষ্টবেঙ্গলে

—"অনেকে বলবেন, আমি ক্যাপ্টেন বলেই ইস্টবেঙ্গলে থেকে গেলাম। আসলে সেটা,কিন্তু আসল কথা নয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ভালবাসি বলেই থেকে গেলাম। তা বলে বলছি না, সুরজিৎদা, চিন্ময়, শ্যামলদা, ভাস্কর, প্রশান্তরা ইস্টবেঙ্গলকে ভালোবাসে না। আমরা সবাই 'ইস্টবেঙ্গল' বলতে অজ্ঞান। কিন্তু তবুও আমি থেকে গেলাম এই কারণে, আমার অন্তত থাকার মতো পরিস্থিতি ছিল বলেই।"

—'এই টীম নিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয়?

—"ভালো কিছু পারবো বলছি না। তবে টীমে যখন আছি তখন টীমের হয়ে জান লড়িয়ে দেবো। নিজে ভালো খেলার চেষ্টা করবো। টীমে সুধীরদা, হাবিবদার মতো সিনিয়র প্লেয়ার রয়েছেন। সবার ওপর প্রদীপদা রয়েছেন। টীমের চিন্তা তাঁরাও করবেন।"

—"মহমেডান তোমায় ডেকেছিল?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় জানিয়েছি।"

—'সুরজিৎরা চলে যাওয়াতে দুঃখ হচ্ছে'?

—"মনটা সেই কারণে হয়ত খারাপ। অনেক বছর পরে আমি সুরজিৎদাদের ছাড়া হয়ে গেলাম। ভাবছি, সুরজিৎদার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। শ্যামলদার কথাও মনে পড়ছে ভীষণভাবে। যাই হোক, চিন্ময়, ভাস্কর, প্রশান্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব সেই আগের মতো থাকবে। আমার বন্ধু বলতে ওরাই।"

উনআশীর সত্যজিৎ

উনআশীর লীগ-যুদ্ধের মহাসন্ধিক্ষণে উত্তর কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে দেখতে আমরা এক অন্য বিষয়ে চলে গেছিলাম। আমরা, অর্থাৎ—ফুটবলার সত্যজিৎ, ক্রিকেটার প্রণব ঘোষ, আমার এক সাংবাদিক বন্ধু এবং আমি। বিষয়—'আগামী ক্যাপ্টেন সত্যজিৎ'। সত্যজিৎ শব্দ করে হেসেছিল—"ক্যাপ্টেন? আমি মোটেই তাতে চিন্তিত নই। আগে জানতাম ক্যাপ্টেন হওয়া কত সুখের ব্যাপার। এখন দেখছি, গড়ের মাঠে এখন সবচেয়ে দুঃখজনক সম্মান হল 'ক্যাপ্টেন' হওয়া।"

●

অনুশীলনের মুহূর্তগুলোতে এতদিন যে—সত্যজিৎ মিত্র বন্ধুভাবে সুরজিৎ সেনগুপ্তকে আটকানোর চেষ্টা করে গেছে, আশীর দশকে সে নতুন ভাবনা নিয়ে মাঠে নামবে। তাকে বার বার ডেকে বলা হবে—'তুমি ঠিক এই ভাবে সুরজিৎ সেনগুপ্তকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে'। সত্যজিৎ বার বার মাথা নাড়বে 'বুঝেছি' 'বুঝেছি' বলে।

তারপর ক্লেভারেশন কিংবা চীন কিংবা শীল্ড কিংবা আর যেখানেই দেখা হোক—যুদ্ধের আগের রাতগুলোতে সত্যজিৎ অনেক কিছু ভাববে। আর ওর মনে পড়বে, তার প্রিয় ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্তর কথা। ট্যাকলিং-এর ফাঁকে হয়ত বা দুজন একটু থেমে যাবে। নিশ্চয় সুরজিত সেনগুপ্ত আলতো করে পিঠ চাপড়ে দেবেন সত্যজিতের। সত্যজিৎ হাসবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়।

●

কুরুক্ষেত্র ও পানিপথের যুদ্ধে যে সব দর্শক উপস্থিত থাকবেন, হয়ত বা তারাও দেখতে পাবেন—সূর্যগ্রহণের মতো একটি সুন্দর দৃশ্য।

প্রি-অলিম্পিকে অন্য ভূমিকায়

পড়ার। শ্যামল ব্যানার্জীরা বটেই, পাকিস্তানের ভারতীয় ডিফেন্সকে অনেকখানি শক্তি জুগিয়েছে।

কিন্তু ডিফেন্সে সৌমেন সরকারের অভাব বারবার অনুভব করতে হয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেছে প্রসূন। তবে সবমিলিয়ে পারমিন্দার নিজের খেলা একটা নির্দিষ্ট মানে বেঁধে রাখতে পেরেছে।

ভারতীয় দলের, আক্রমণ দড় উঠেছে কেন্দ্রিয়ার পায়ারকে কেন্দ্র করে। গতির খুব ভুল না খেললেও, কাজ চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানস ফর্মে ছিল না। ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ফুটবলের মানস নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারবে।

দুই কোচ বললেন

কোচ শাহ টীমের খেলায় খুব সন্তুষ্ট নন। বাহরিনগামী টীমের সকলকে না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ করলেন। বললেন, ভাস্কর না থাকলে পুরো টুর্নামেন্টেই অন্তত কুড়িটা গোল খেতে হত। আর শেষরক্ষা ইরানের বিরুদ্ধে খেলা শেষ হওয়ার বারো মিনিট আগে অকস্মাৎ প্রকাশ করে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে। তারা এই ঘটনার নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, এই সব ব্যাপারে সকলের সুশৃঙ্খল হওয়া উচিৎ সৌমেন সরকার। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "সত্যজিৎ যখন ক্যাম্পে যায়নি, তখন চিন্ময় বা ফিলিপের মধ্যে যে কোন একজন আক্রমণাত্মক সাইড ব্যাককে নিলেন না কেন?" বাসার সংক্ষিপ্ত জবাব," ভুল হয়েছে।"

সহযোগী কোচ অরুণ ঘোষ ক্যাম্পে ছিলেন না। তাই বিশেষ মন্তব্য করতে রাজী হননি। তবে বলেছেন, "আমি নির্বাচক হলে, দুই এক জন মিড-ফিল্ডার এবং ফরোয়ার্ডকে ভারতের জার্সি গায়ে চড়ানোর সুযোগ দিতাম।" তিনি প্রশংসা করলেন চারজনের ভাস্কর, মনোরঞ্জন, শ্যামল এবং পারমিন্দার।

দেখা এবং শেখা

খেলোয়াড় হিসেবে কিছু রিপোর্ট আগে করেছি। এই প্রথম মাঠের থেকে সরাসরি পালন করলাম। কম্বিনেশনের উপর রিপোর্ট খেলা দেখেছি, কেউ না চেনায় কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের সীটে ছিলেন একজন দীর্ঘকায় যুবক। তিনি চারবারে ভারতীয় দলকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। একজন খেলোয়াড়কে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, 'মশিয়ে শিম' এর ছিদ্রটি কি?" হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "স্যার, আপনার নাম?" চটপট জবাব এল, "মির জাক।" আমি যোগ করলাম "ফ্রম অল ইন্ডিয়া?"

প্রত্যাবর্তন

মতি নন্দী



লোকটা আজও এসেছে। এই নিয়ে পরপর পাঁচদিন।

"কি জন্য আসে বলতো এই ভোর বেলায়?" পল্টুকে বললাম। "কাল দেখছিলাম আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে আবার হাসছিলও।"

ফুটবলটা মাটিতে থাপাতে থাপাতে পল্টু নিমগাছতলাটার দিকে তাকাল। লোকটা ওইখানে বসে রয়েছে। ওইখানেই আমরা পোশাক বদলাই, বুট পরি ও খুলি, প্র্যাকটিসের পর বিশ্রাম নিই, সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খাই। এত ভোরে কারখানার এই মাঠটায় আমরা দুজন, ছাড়া আর কেউ আসে না। অবশ্য আসার উপায়ও নেই। সারা মাঠ পাঁচিলে ঘেরা। শুধু এক জায়গায় পাঁচিলটা ভাঙা। শ্রম ও সময় বাঁচাবার জন্য আমরা সেই ভাঙা জায়গা দিয়েই মাঠে ঢুকি। মাঠ থেকে লোকালয় প্রায় সিকি মাইল দূরে। এ তল্লাটে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে ফুটবল খেলার এতবড় মাঠ আর নেই। আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় এই লোহা-কারখানার ফোরম্যান। তার সুপারিশে ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি, সকালের প্র্যাকটিসের। এ বছর থেকে আমরা দুজনেই ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব তাই উৎসাহটা বেশীই। গরম পড়তে না পড়তেই প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছি।

"পাগল-টাগল বোধ হয়।" পল্টু এর বেশি কিছু বলল না।

গাছতলায় দুজনের, ব্যাগ আর বলটা রেখে লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে আমরা প্রায় নগ্ন হয়েই শর্ট প্যান্ট পরলাম। বুট পরতে পরতে একবার তাকালাম খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়িওয়ালা, অপরিচ্ছন্ন শীর্ণকায় আধবুড়ো লোকটার দিকে। দুজনেই ঘড়ি খুলে ব্যাগে রেখেছি। আমরা মাঠের মধ্যে থাকব এই লোকটা থাকবে ব্যাগ দুটোর কাছে, মনে হওয়া মাত্র অস্বস্তি বোধ করলাম। ঘড়ি পরেই থাকব কিনা ভাবলাম। পল্টুর পক্ষে সম্ভব নয় কেননা সে গোলকীপারে খেলে। ওকে প্রায়ই মাটিতে ঝাঁপ দিতে হয়। লোকটাকে যে অন্য কোথাও বসতে বলব, তাতেও বাধো বাধো ঠেকল। ওর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের তকমা আঁটা থাকলেও, বসার ঋজু ভঙ্গিতে অকম্পিত চাহনিতে বা চোয়ালের উদ্ধত বঙ্কিমতায় এমন একটা সহজ জমকালো ভাব রয়েছে, যেটা ছিঁচকে চোর সম্পর্কে আমার ধারণার সাথে একদম মেলাতে পারলাম না।

লোকটি শিশুর কৌতূহল নিয়ে আমাদের বুটপরা দেখছে। এই ক'দিন ময়লা ধুতি আর সাদা হাফহাতা শার্ট পরে আসছিল, আজ দেখি একটি পরনে চলচলে কিন্তু ঝুলে খাটো, মোটা জিনের নীল পাজামা। কয়লার ও মেশিন-ঘরের শ্রমিকরা যে রকমটি পরে। চকোলেট রঙের কলার দেওয়া ক্যাম্বিসে হলুদ রঙের সিল্কের যে গেঞ্জিটা পরেছে সেটাও ঢলঢলে। মনে হয় অন্য কারুর পাজামা ও গেঞ্জি পরে এসেছে।

"আপনারা অ্যাংক্লেট পরলেন না যে?" লোকটির হঠাৎ প্রশ্নে আমরা দুজনেই মুখ ফেরালাম। পল্টু গম্ভীর স্বরে বলল, "পরার কোন দরকার নেই তাই। ওতে সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি হয়।"

লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। আমাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে বলল সুবিধে হয় না, প'রে কখনো খেলেছেন?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "বড় বড় প্লেয়াররা সবাই অ্যাংক্লেট পরেই খেলেছে—সামাদ, ছোনে, জুম্মা, করুণা—কই ওদের তো অসুবিধে হয়নি। ওদের মতো প্লেয়ারও তো আর হল না।"

"আর হবেও না কেননা খেলার ধরনই বদলে গেছে।" এবার আমিই জবাব দিলাম।

"গেলেই বা। শুটিং, হেডিং, ড্রিবলিং ট্যাকলিং, পাসিং, এসবতো আর বদলায়নি।" লোকটি মিটমিটি করে হেসে আবার বলল, "আজকাল হয়েছে শুধু রকমারি গালভরা নামওলা সব আইডিয়া। সেদিন এক ছোকরা আমায় ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল। আরে এতো দেখি সেই আমাদের আমলের টু-ব্যাকেরই খেলা। হাফ-ব্যাক দুটো নেমে এলেই তো ফোর ব্যাক—"

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি আর পল্টু নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে মাঠে নেমে পড়েছি। রোজই প্রথমে আমরা মাঠটাকে চক্কর দিয়ে কয়েক পাক দৌড়ই। শুরু করার আগে পল্টু চাপা স্বরে বলল, "গুলিখাওয়া বাঘ। আনাদার ক্যাপ্টেনের ওল্ড ফুটবলার।"

পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে দুজনেই লক্ষ্য করছিলাম লোকটাকে। এক সময়ে দুজনেই থেমে পড়লাম। বলটা গাছ-তলাতে রেখে আমরা দৌড়তে নেমেছি। ইতিমধ্যে সেটিকে নিয়ে লোকটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের কাটাতে ব্যস্ত। প্রায় দু' ফুট ব্যবধানে গাছটাকে একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে খেলিয়ে, পায়ের চেটো দিয়ে বলটাকে টানল, বলটা লাফিয়ে ডিঙিয়ে গেল,

ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড শট করার ভান করে পা তুলে আলতো শটে বলটাকে ডান দিকে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকে যেন সামনে দাঁড়ান কাউকে এড়িয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখতে লাগল বলটা গোলে ঢুকছে কিনা। বলটা গড়াতে গড়াতে থেমে যেতেই দুহাত তুলে হাসতে শুরু করল। মনে হল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের আহাম্মক মুখগুলো দেখে হাসি সামলাতে পারেনি।

পল্টুকে বললাম, "বোধ হয় এককালে খেলত।"

নকল আতঙ্ক গলায় ফুটিয়ে পল্টু বলল, "সেরেছে। মিলিটারিদের সঙ্গে খেলার গপ্পো শুরু করবে না তো।"

"তোর এই সব বাজে ধারণাগুলো মাথা থেকে তাড়া।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, "সে আমলে সত্যিই অনেক ভাল ভাল প্লেয়ার ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল। গোরারা তাদের ভয়ে ঠকঠক কাঁপত। তারা ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূর থেকে মেরে মেরে গোল দিত। রেকর্ডের খাতা খুলে দ্যাখ সেই সব শটের কোন পাত্তাই মিলবে না। বড়জোর একগোল কি দুগোল, আর বাবুরা খেতেন পাঁচ-ছ গোল।" এই বলে পল্টু আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই আবার ছুটতে শুরু করল।

আমি মাঠের বাইরে লোকটার দিকে তাকালাম। এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পায়ে বলটাকে মেরে মেরে শূন্যে রাখার চেষ্টা করছে। তিন চার সেকেণ্ডের বেশি পারছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলটাকে লাথি মেরে মাঠের মাঝখানে পাঠিয়ে দিল। যখন শুটিং প্র্যাকটিস শুরু করলাম লোকটা মাঠে এসে দাঁড়াল। কারখানার মেল্টিং শপের দেয়ালটায় খড়ির দাগ টেনে পোস্ট এঁকে নিয়েছি। ক্রসবারটা কাল্পনিক। যে সব বল পল্টু ধরতে পারে না, দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে আসে। লোকটা তুমুল উৎসাহে ছোটাছুটি করে সেই বল ধরে, যেন ছাত্রদের সামনে শুটিং-এর টেকনিক বোঝাচ্ছে এমন কায়দায় পা দিয়ে মেরে আমার ফিরিয়ে দিতে লাগল আর সমানে বকবক করে চলল।

"উঁ হুঁ হুঁ, উপর দিয়ে নয়, মাটিতে, সব সময় মাটিতে রাখতে হবে...উপরে তোলা মানেই গেল, নষ্ট হয়ে গেল।" ঊর্ধ্বশ্বাসে বল ধরতে ছুটে গেল। "আজকাল তো এই সব ক্ল্যাসিক শুড় পাস দেখতে পাই না, কুমারবাবু দিতেন।" আবার ছুটে গেল। সে দিন ছোকরাটাকে বলেছিলুম, যে ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল...আরে বাবা ছক কষে কি আর ফুটবল খেলা হয়...মাটিতে মাটিতে তুলে নয়

হ্যাঁ এখন অনেক বেশি খেলতে হয় বটে, সে কথা আমি মানি, খাটুনি বেড়েছে...হল না হল না, শু দেবার সময় পায়ের চেটোটা ঠিক এই ভাবে, দিন বলটা আমায় দিন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বলটা ওকে দিলাম। দূর থেকে পল্টু খিঁচিয়ে উঠল, "আমি কি হাঁ করে তাকিয়ে থাকব? শট কর শট কর।"

লোকটি অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলটা আমার দিকে ঠেলে দিল। "দমাদম গোলে বল মারলেই কি ফুটবল খেলা হয়, কিছুও প্র্যাকটিস করতে হয়।" এই বলে লোকটি ক্ষোভ প্রকাশ করল বটে কিন্তু বল ধরে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ বন্ধ করল না। পা ফাঁক করে কুঁজো হয়ে দৌড়, বলটাকে ধরেই কাউকে যেন কাটাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে পায়ে খেলিয়ে নিয়ে যেন যথার্থ একটি পাস দিচ্ছে, আমার সামনে বলটা বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করল, "ওয়াট শুট।" পড়ামাত্র বলেই শট করলাম, ঝাঁপিয়ে পড়া পল্টুর বগলের তলা দিয়ে একটা প্রচণ্ড গতিতে দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে এল। "গোও-ও...ল।" বলে লোকটি হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। শটটির নিখুঁততায় আমিও চমৎকৃত। লোকটি উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে বলল, "কাকে শু বলে দেখলেন তো। আর এই জিনিস আপনারা খেলা থেকে কিনা তুলে দিয়েছেন! আজকাল কি যে মাদ্রন-টু মানে খেলা হয়েছে, বিউটিই যদি না থাকে তাহলে—"

আমি দেখলাম পল্টু মুখ লাল করে ছুটে আসছে। শিউরে উঠলাম। পল্টুর মাথা অল্পেই গরম হয়। সামান্য উসকানিতেই ঘুষোঘুষি শুরু করে।

"আমরা এখানে এসেছি প্র্যাকটিস করতে," ভারী গলায় পল্টু বলল। "আপনাকে তো আমরা ডাকিনি তবে কেন গায়ে পড়ে ঝামেলা করছেন। খেলা যদি শেখাতে চান, তবে অন্য কাউকে ধরে শেখান। প্লিজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।"

পল্টু গটগট করে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। লোকটা অবাক হয়ে পল্টুর দিকে তাকিয়েছিল। দেখলাম ক্রমশ মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাথা নামিয়ে গাছতলার দিকে যখন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওর চলনকে শীর্ণ পাজামা আর কুঁজো পিঠটার দিকে তাকিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া শ্যাওলাধরা একটা পাথরের কথাই মনে এল। আমরা যখন বিমর্ষভাবে বসে থাকছিলাম, লোকটি তখন উঠে গেল। যেতে যেতে পল্টু শুরু করল আমাদের নতুন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারীর মেয়ের গল্প। নিয়মিত খেলা

দেখে, প্লেয়ারদের সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘোরে এবং কার সঙ্গে তাকে কোথায় কখন দেখা গেছে, পল্টু যখন তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল তখন হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটি ধীরে ধীরে ছুটতে শুরু করেছে মাঠটাকে পাক দিয়ে। ঠিক আমরা যেভাবে ছুটি। আমার সঙ্গে পল্টুও অবাক হয়ে তাকাল।

এক পাক শেষ করে যখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল, দেখি জলজলে চোখ দুটি কঠিন দৃষ্টিতে সামনে নিবদ্ধ। আমাদের দিকে বারেকের জন্যও তাকাল না। সরু বুকটা হাপরের মতো ওঠা নামা করছে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য মুখটা খোলা। পিছন থেকে শীর্ণ চওড়া দেহের উপরে কালির পোঁচড়ার মত চুল ভর্তি মাথাটাকে নড়বড় করতে দেখে হাসিই পেল। কিন্তু পরক্ষণেই কষ্ট হল আধবুড়ো লোকটির ঐ ধরনের ছেলেমানুষি প্রয়াস দেখে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ও নিজেকে আমাদের সমান প্রতিপন্ন করতে যেন গায়ের জোরেই ছুটছে বয়সের বাধা ঠেলে ঠেলে। মনে মনে চাইলাম ছেলেমানুষের মত এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করে এখান থেকে ও চলে যাক।

"টেঁসে না যায়, তাহলে আবার হ্যাঙ্গামে পড়তে হবে।" পল্টুর স্বরে সত্যিকারের উৎকণ্ঠা কিছুটা ফুটল। লোকটা দেড়পাক ছুটেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ তুলে হাঁ করে আছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মনে হল আমাদের দিকে বারকয়েক আড়চোখে তাকালও। হয়তো কোলাপ্স করে পড়ে যেতে পারে ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ছুটার ভঙ্গিতে পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। তাই দেখে আবার কষ্ট পেলাম। পল্টু হোহো করে হেসে উঠল।

দিন ছয়-সাত লোকটি এল না। অবশ্য হয়ে ভাবলাম আর বোধ হয় আসবে না। কিন্তু লোকটি এল, সঙ্গে তিন-চারটি তালিমারা চ্যাবড়েবে একটি ফুটবল নিয়ে। আমরা যথারীতি প্র্যাকটিস করতে লাগলাম আর তখন সে মাঠের অপরদিকে নিজের বলটি নিয়ে কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের নাস্তানাবুদ করায় ব্যস্ত রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দেখলাম, বলটিকে পায়ের কাছে রেখে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "একবার বলটা ওর দিকে গড়িয়ে যেতেই চোখদুটো চকচক করে উঠল। সামনে ঝুঁকে এসেও দিয়েও প্রাণপণে নিজেকে যেন ধরে রাখল।

"ক'দিন দেখিনি যে আপনাকে?" বললাম নিছকই সৌজন্যবশত।

"শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল।" গম্ভীর

ধরে বলার চেষ্টা করল।

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, দেখুন তো থু ওলো ঠিক মত হচ্ছে কিনা?"

একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠল, "ওকি ওকি! হচ্ছে না।" আমি ফিরে তাকাতেই আবার বলল, "চটপট করতে হবে, কিন্তু কম স্পীডে। কিক্ করার সময়ও তাই। পায়ের পাতার ওপর দিক দিয়ে। বুটের ডগা মাটির দিকে—এই রকমভাবে। তারপর ফলো-থ্রু টা হবে—এই রকম! করুন তো একবার?"

ফার্স্ট ডিভিসনে খেলতে যাচ্ছি আর এখন কিনা শুট করার প্রাথমিক নিয়ম এইরকম একটা লোকের কাছ থেকে শিখতে হবে, ভাবতেই বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। ওকে অগ্রাহ্য করে আগের মতনই শুট করতে লাগলাম। বার দুয়েক চেঁচিয়ে ও চুপ করে গেল। বুঝতে পারছি লোকটির একজন চেলা দরকার যে ওর উপদেশ শুনবে, মান্য করবে, আমরা যে ওর কথা অনুযায়ী কাজ করব না সেটা নিশ্চয় বুঝে গেছে।

পরদিন সকালে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা মাঠে এসে দেখি চেলা জুটে গেছে। থপথপে বোকা চেহারার একটা ছেলে বৃষ্টির মধ্যে কাঠের মত দাঁড়িয়ে বল নিয়ে লোকটার লম্ফ ঝম্ফ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ওর পাগলামি আর উৎসাহ দেখে অবাক হলাম। কিন্তু বৃষ্টির জল গায়ে বসাবার ধাত্‌ বা বয়স ওর নয়। পল্টুকে বললাম, "নির্ঘাৎ নিমোনিয়া হবে লোকটার।"

"হোক্। কিন্তু এটাকে কোত্থেকে ধরে আনল, একটা হাঁদা গোবরগণেশ। সারা জীবনেও তো খেলা শিখতে পারবে না।"

দূর থেকে আমরা শুনতে পেলাম লোকটির নির্দেশ দেওয়া। যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে। "বলের উপর দিয়ে যদি এইভাবে যাও"—ছোট্ট একটা লাফ—"তাহলে কিস্‌সু হবে না। তোমায় করতে হবে কি এইভাবে, তারপর এইভাবে নিয়ে যাবে। তাহলে দোনামনায় পড়বে তোমার অপোনেণ্ট।"

ছেলেটি একাগ্র হয়ে দেখছে আর প্রত্যেক কথায় ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু লোকটি ওকে বল নিয়ে চেষ্টা করতে বলছে না। "এইবার দেখাচ্ছি কিভাবে পায়ের চেটো দিয়ে পাস দিতে হয়।" চ্যাপচ্যাপে বলটা কাদায় আটকে গেল। লোকটি ছুটে গিয়ে ড্রিবল করতে করতে বলটাকে আনল। ছেলেটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ফোঁটা থুতনি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। চুল কপালে লেপটে। শার্টের ভিতর থেকে গায়ের সাদা চামড়া ফুটে উঠেছে।

"এইবার দেখো ডগা দিয়ে কি করে বল তুলতে হয়।" তুলতে গিয়ে পা পিছলে লোকটি পড়ে গেল। ছেলেটি কিন্তু হাসল না। বরং লোকটিই হেসে উঠল। এই সময় হঠাৎ বৃষ্টির বেগ বাড়তে আমরা প্র্যাকটিস বন্ধ করে ফিরে গেলাম। যাবার সময় দেখি লোকটি ছেলেটির চারপাশে বল নিয়ে ঘুরছে আর নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে।

পরদিন পল্টু প্র্যাক্‌টিসে এল না। চোট পেয়ে ওর হাঁটু ফুলে উঠেছে। একাই হাজির হলাম মাঠে। নিমগাছতলায় লোকটি বসে। চেলাটি তখনো আসেনি। আমায় দেখে হেসে বলল "আর একজন কই?"

কারণটা বললাম। তারপর কথায় কথায় ওর কাছে জানতে চাইলাম, কী করেন কোথায় থাকেন এবং ফুটবল খেলতেন কোন ক্লাবে। উত্তর দিতে ওর খুব আগ্রহ দেখলাম না শুধু জানলাম মাইলদুয়েক দূরে ভট্টাচার্য পাড়ায় ভাইয়ের বাড়ীতে থাকেন। অবিবাহিত, যুদ্ধে গেছলেন। ফিরে এসে কারখানায় ওয়েল্ডারের কাজ করেন। প্লুরিসি হওয়ায় কাজ ছেড়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে যৎসামান্য জমিজমা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখন আর ভাল লাগছে না, তাই ছোট ভাইয়ের কাছে এসেছেন, কিন্তু এখানেও নানান অসুবিধা—অশান্তি। ভাবছেন, আবার দেশে ফিরে যাবেন।

"হ্যাঁ খেলতুম।" কাশতে শুরু করল। পিঠটা বেঁকে গেল কাশির ধমকে। বার কয়েক থুথু ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "বরাবর বুট পরেই খেলছি। এক বছর কালীঘাটে ছিলুম, জোসেফ খেলত তখন। নাম শুনেছেন ওর?"

আমি মাথা নাড়লাম। কি একটা বলতে যাচ্ছিল, আবার কাশি শুরু হতেই থেমে গেল। গতকাল বৃষ্টিতে ভেজায় মাশুল। এই দুর্বল শরীরে আজ যদি খেলা দেখাতে মাঠে নামে তাহলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে, এই ভেবে ওকে বললাম, "আজ বোধ হয় আপনার শিষ্যটি আসবে না। বরং আপনি বাড়িই ফিরে যান।"

"না না, আসবে, ঠিক আসবে। বলছি ওকে ফুটবলার তৈরী করে দেবই, তাতে যদি জীবন যায় তো যাবে। আমি যে পদ্ধতি নিয়েছি তার আর মার নেই। বুঝলেন, যে কোন বস্তুর উপরে যদি ইচ্ছার প্রভাব খাটান যায় তাহলে সফল হবেনই।" দুবার কেশে নিয়ে আবার বলল, "বস্তুটি যদি কাঁচা হয়, তার মানে যদি অল্পবয়সী হয় তাহলে যে কাউকেই দুর্দান্ত প্লেয়ার করা যাবে। আমার এখন বয়স হয়ে গেছে, নয়তো নিজের উপরই পদ্ধতিটা পরখ করতাম।"

ছেলেটিকে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে আসতে দেখলাম। লোকটি তখন মাঠের অন্য ধারে প্রায় পত্রহীন একটা শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, গাছ তো তার পাতার মধ্য দিয়ে যা শুষে নেয় তাই দিয়েই খাদ্য তৈরী করে বেঁচে থাকে। তাই যদি হবে তাহলে ওই গাছটা কি করে বেঁচে রয়েছে?" তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন ব্যক্তিগত সমস্যার দায় ধ্বনিত হল—"পাতাই নেই তাহলে বেঁচে আছে কি করে?"

হঠাৎ লোকটিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করল এবং দুঃখও বোধ করলাম। যে পদ্ধতিতেই খেলা শেখাক এই গাব্‌দা চেহারার ছেলেটি যে কোনোদিনই ফুটবলার হতে পারবে না, তাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। ছেলেটাকে একবারও বলে লাথি মারতে না দিয়ে লোকটি নিজেই লাফালাফি করে যাচ্ছে। ছেলেটি সামান্য চনমনে হলে নিশ্চয় এভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। বস্তুত, এরকম হাঁদা ছেলে না পেলে লোকটি তাকে শিষ্যও বানাত না।

প্রায় আধঘন্টা বসে থেকে লোকটির কর্মকাণ্ড দেখলাম। ছেলেটি চলে যেতেই আমার খাবারটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, "আমি তো আজ প্র্যাকটিস করলাম না, তাছাড়া খিদেও নেই।"

ভ্রু কুঁচকে বলল, "করুন না, আমি গোলে দাঁড়াচ্ছি।"

"না থাক, আজ মন লাগছে না।"

লোকটি আর কথা বাড়াল না। খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে পকেটে রাখল। কোন কুণ্ঠা দেখলাম না। বিনয় দেখিয়ে ধন্যবাদও জানাল না। আমরা এক সঙ্গেই মাঠ থেকে বেরোলাম, হাঁটতে হাঁটতে লোকটি একসময় বলল, "আমার কি মনে হয় জানেন, ফুটবলের তুল্য আর কোন খেলা পৃথিবীতে নেই। ক্রিকেট হকি ব্যাডমিণ্টন টেনিস যাই বলুন, সবই একটা ডাণ্ডা নিয়ে খেলতে হয়। ডাণ্ডা হাতে মানুষ। তার মানে প্রায় সেই বনমানুষের যুগের ব্যাপার। ফুটবল হচ্ছে সভ্য মানুষের খেলা, এর মধ্যে অনেক সায়েন্স আছে। সেটা রপ্ত করতে পারলে... ভাল কথা আপনার কি কোন বাতিল ছেঁড়া বুট আছে? কাল দেখলেন তো, কেমন পিছলে পড়ে গেলুম। বুট হলে আরও ভাল ক'রে ডিমনস্ট্রেট করতে পারি।"

মাথা নেড়ে জানালাম, দেবার মত বুট আমার নেই। শুনে আফশোসে টাগরায় জিভ

লাগিয়ে শব্দ করল। ওর পাশে দুটি লক্ষ্য করলাম, আগের থেকে পাণ্ডুর এবং বসে গেছে। চলচলে নীল পাজামাটার গত দিনের কাদা শুকিয়ে আটকে রয়েছে। ডালিমারা বলটা দুহাতে বুকে চেপে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে ওর হাঁটা প্রায় বাচ্চাছেলের মত দেখাচ্ছে কিন্তু চোখ দুটিতে দারুণ উত্তেজনা। মনের মধ্যে হয়তো প্রতিপক্ষকে একের পর এক ড্রিবল করে এখন কাটিয়ে চলেছে। আমাকে কোন রকম বিদায় না জানিয়েই মোড়ে পৌঁছে আপন মনে সে নিজের বাড়ির পথ ধরল।

পরের সপ্তাহে ছেলেটিকে প্রথমবার বল নিয়ে নড়াচড়া করতে দেখলাম। দেখে মনে হল ওর থেকে এই আধবুড়ো লোকটি জোরে কিক্ করতে পারে, লাফাতে পারে। ছেলেটি কেন যে এত জিনিস থাকতে ফুটবল খেলা শিখতে এল ভেবে অবাক হলাম। আধঘণ্টা পরে, ছেলেটি চলে যাওয়া মাত্র বললাম, "কি রকম মনে হচ্ছে, হবে টবে কিছু?"

"নিশ্চয়।" লোকটি প্রচণ্ড উৎসাহে বলল, "ঠিক করেছি এবার ওকে নামাব। যা কিছু শিখিয়েছি, সেগুলো খেলায় ব্যবহার করার মত উপযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ওর স্কুলের একটা ট্রায়াল ম্যাচ আছে এই শনিবার ও খেলবে। আমি টাচ লাইন থেকে দরকার মত বলে বলে দেব।"

"ওকে আগে কখনও কি খেলতে দেখেছেন।"

"না, দরকারই বা কী। এতদিন ধরে যা যা শিখিয়েছি সেটাই আমার দেখা দরকার। উন্নতি করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নইলে ট্রায়াল ম্যাচে চান্স পাবে কেন!"

এবার আমি লোকটির জন্য হতাশা বোধ করলাম। নিজের কল্পনার জগৎকে আরোপ করবার চেষ্টা করছে বাস্তব জগৎ-এর উপর। ফলাফল ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে দেখলাম, কুঁজো হয়ে, পা ফাঁক করে লোকটি টাচ লাইন ধরে ছুটোছুটি করছে আর কিছু ছেলে ওর পিছনে ছুটছে, ভ্যাংচাচ্ছে, হাসছে, জামা ধরে টানছে। মাস্টার মশাইরা বলছেন, পাগলটাকে সরিয়ে দিতে। দেখতে পেলাম, অপমানে লজ্জায় ওর জলজলে চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে মাথা নামিয়ে আর একপাল ছেলে ওর পিছু নিয়েছে।

"এখনই ওকে মাঠে নামানোটা কি একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?" যথাসম্ভব নম্রকণ্ঠে বলেছিলাম। "মাত্র ক'দিন তো শেখাচ্ছেন?"

"আমি হিসাব রেখেছি, মোট পঁচিশ ঘণ্টা ওকে কোচ করেছি। ছেলেদের ফুটবলে ভাল স্ট্যাণ্ডার্ডে রিচ করতে পঁচিশ ঘণ্টার কোচিংই যথেষ্ট।"

"কিন্তু এছেলেটাকে তো পাঁচশো ঘণ্টা কোচ করলেও কোন স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছতে পারবে না।"

প্রথমে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ইচ্ছেটা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আপনি বুঝবেননা। আপনি ইচ্ছে করুন সামান্য কি ছোনে কি গোষ্ঠ পালের মত খেলবেন...কিংবা আজকাল যাদের খুব নাম শুনি—পেলে, ইউসেবিও...তা হলে ঠিক তৈরী হয়ে যাবেন।"

এই নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। ভাবলাম, যা খুশি করুক আমার তা নিয়ে মাথাব্যথার দরকার নেই। বরং শিক্ষা পেলে ওর জ্ঞানচক্ষু ফুটবে। লোকটি এরপর এক সপ্তাহ অনুপস্থিত রইল। রোজই পল্টুর সঙ্গে প্র্যাকটিসের সময় ভাঙা পাঁচিলটার দিকে তাকাতাম। এই বুঝি আসে। পরে মনে হত, ছেলেটা নিশ্চয় ওকে বুঝিয়েছে তাই আমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে বলেই আসছে না।

একদিন লোকটিকে আবার দেখলাম। নিমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্র্যাকটিস দেখছে। পরনে লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওকে দেখতে পেয়েছি বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সেদিনকার ট্রায়াল ম্যাচের খবর কী?"

লোকটি একবার থমকাল। তারপর চলতে চলতেই বলল "শুধু ইচ্ছেতেই হয় না, কিছুটা প্রতিভাও থাকা দরকার। আমারই ভুল হয়েছে।" এরপর ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকাল। আমি ওর চোখে গাঢ় প্রত্যাবর্তন কামনা দেখতে পেলাম। ওর চলে যাওয়া দেখে মনে হল, একটা আহত পশু গভীর অরণ্যের নির্জনে প্রাণ দেবার জন্য যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

কিছুদিন পর বাজার যাবার পথে ছেলেটিকে দেখতে পেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর থেকেও কমবয়েসী ছেলেদের ডাংগুলি খেলা দেখছিল। লোকটির খবর জিজ্ঞেস করতেই ও বিরক্ত স্বরে বলল, "কে জানে। বোধহয় আবার অসুখ-বিসুখ হয়েছে।"

"কোথায় থাকে জান?"

"জানি তবে আমি কিন্তু নিয়ে যেতে পারব না। আমায় দেখলেই এমনভাবে তাকায় যেন ভস্ম করে ফেলবে। আচ্ছা কি দোষ বলুন তো, মাঠে এমন কাণ্ড শুরু করল যে, ছেলেরা ওর পেছনে লাগল। এজন্য কি আমি দায়ী?"

"মোটেই না।"

"তাহলে। আমি যদি খারাপ খেলি তাই বলে সকলের সামনে অমন হাউহাউ করে কাঁদবে একটা বুড়ো লোক?"

"তুমি বরং দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দাও। সেটা পারবে তো?" অধৈর্য হয়ে বললাম।

"তা পারব।" ছেলেটি বিরক্তস্বরে বলল।

কথামত দূর থেকে বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েই ছেলেটি চলে গেল। জায়গাটা আধাবস্তি। তিনদিকে টালির চাল দেওয়া একতলা ঘর, মাঝখানে উঠোনের মত খোলা জায়গা। অনেকগুলো বাচ্চা হাটোপাটি চীৎকার করছে। তার পাশেই খোলা নর্দমা, থকথকে পাঁক ভরা। একধারে লাউয়ের মাচা। ছিটছিটে ছেঁড়া তোশক বাঁশে ঝুলছে। আঁস্তাকুড়ে একটা হাঁস ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে খাদ্য বার করছে। একজন স্ত্রীলোক এসে একটি বাচ্চার পিঠে কয়েকটি চড় মেরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার প্রশ্নে, বাচ্চার মুখে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। একটু কৌতূহলও প্রকাশ করল না।

ঘরের দরজাটি পিছন দিকে। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালাম। দেয়ালে অজস্র ক্যালেণ্ডার আর তোরঙ্গ, কৌটো, ঘড়া, বিছানা, মশারী প্রভৃতিতে বিশৃঙ্খল ঘরের কোণায় গুটিশুটি লোকটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া হয়ে বসে। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দেয়ালে। পাশ থেকে দেখতে পেলাম থুতনিটা এমন ভঙ্গিতে তোলা যেন কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। ঘাড় উঁচু হয়ে চোখ দুটিকে আরও ঢুকিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু শরীরে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে এবং লোকটি আরামে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মনে হল।

হঠাৎ ও ঘাড় ফেরাল। চোখাচোখি হল আমার সঙ্গে। মাত্র কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু ওর চোখে কোনরূপ ভাবান্তর প্রকাশ পেলনা। রিক্ত কৌতূহলবর্জিত শূন্য চাহনি মনে হল নিশ্চয় প্রাচীন এক শিমুলের কাণ্ড, জরাপ্রাপ্ত শাখার মত যার বর্ণ, গতিহীন, সকরুণ প্রত্যাবর্তনরত। আমি পরিচিতের হাসি হাসলাম। ওর চোখে তা প্রতিফলিত হল না।

ঠিক পথেই সুরজিৎ

কাজল মুখার্জী

এক্সপ্রেসে বোম্বাইয়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলা। একজন নির্বাচিত খেলোয়াড়কে টীমে নেওয়া হল না। ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কারণ জানতে চাইলাম। ওঁরা বললেন, 'নিয়ে লাভ নেই'। বললাম যে খেলোয়াড় এক বছরের জন্য আপনার ক্লাবে খেলতে এসেছে তাকে আপনারা কোনো যুক্তিতেই টীমের সঙ্গে না নিয়ে যেতে পারেন না। এটা অন্যায়। এটা সেই খেলোয়াড়ের পক্ষে অসম্মানজনক।

কিন্তু কোনো লাভ হল না। বরং আমি ক্লাবের বিষ নজরে পড়ে গেলাম। এবং সেই থেকে শুরু হল একাধিক ঘটনা।

ম্যানেজার জানালেন, সাড়ে আটটার মধ্যে তোমরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকবে। যথাসময়ে আমরা যখন স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম, দেখি ট্রেন তার অনেক আগেই প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে। ১৪ জন খেলোয়াড় বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই মুহূর্তে আমি নিজের রাগ সামলাতে না পেরে টীমের ম্যানেজারকে বোম্বাই গিয়ে এক হাত নিলাম। ফলে আমার ওপর রাগ বাড়তে থাকলো। আমাদের খেলার দিনগুলোতে ম্যানেজার প্রায় সময় শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকতেন না। রেসের মাঠে যেতেন। একদিন ওঁর বালিশের নিচ থেকে রেসের বইও পেয়ে-ছিলাম। এই নিয়ে হোটেলেই আমি হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলাম। আমিই একমাত্র প্রতিবাদ করে বলেছিলাম — এ সব অন্যায় কাজ এখানে চলবে না।

কারোর ব্যক্তিগত সাধ আহলাদ নিয়ে আমার কোনো কিছু বলার নেই। কিন্তু টীমের স্বার্থে কেউ যদি অন্যায় করে (আমিও যদি করি) তখন চুপ থাকতে পারি না।

ম্যানেজার আমার বিরুদ্ধে একহাত নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার বিরুদ্ধে একটা কিছু সুযোগ পেলেই উনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

যাই হোক, মূল ঘটনা ঘটলো গোয়ার সঙ্গে খেলার দিন মাঠেই। খেলা চলাকালীন গোয়ার একজন খেলোয়াড়ের সাথে আমার একটা সংঘর্ষ হতেই রেফারী প্রাদেশ ভাষা আমাকে মারচিং অর্ডার দিলেন। আমি ছুটে গিয়ে রেফারীর কাছে মারচিং অর্ডারের কারণ জানতে চাইলাম। উনি কোনো কারণ জানাতে পারলেন না। সেই অবস্থায় ক্যাপটেন মণ্টু ভট্টাচার্য সহ আমাদের টীমের কয়েকজন রেফারীকে ঘিরে ধরলো। মণ্টু বললো, আমাকে ছাড়া টীম খেলবে না। শেষ পর্যন্ত আমরা খেললাম না।

রেফারী কমিটি আইনজ্ঞ দাশগুপ্তকে নিয়ে এক তদন্ত কমিশন বসালেন। এবং ওঁরা ইস্টবেঙ্গলকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে শুনলাম, আবার একটা তদন্ত কমিশন বসছে। বিধুভূষণ ঘোষের বাড়ীতে আমাকে ডাকা হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম ও বুঝলাম, আমার বিরুদ্ধে ক্লাব একটা অ্যাকশন নিচ্ছে। আমাদের টীমের দু-তিনজন খেলোয়াড়ও আমার নামে দোষ চাপিয়েছে। ভীষণ রাগ হল। সেখানেই



দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, আমার বিরুদ্ধে যা খুশী অ্যাকশন নিতে পারেন. আমি অন্যায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্লাবে থাকতে চাই না।

শেষ পর্যন্ত বাহাত্তরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে তাড়িয়ে দিল।

সুতরাং আজ সুরজিতের সঙ্গে ক্লাব যে ব্যবহার করছে, তাতে আমি মোটেই অবাক হই নি। কোনো ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় কোনো-দিনই অন্যায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারেনা। যে সুরজিৎ ইস্টবেঙ্গলের সুখে দুঃখে অনেক বছর জড়িয়ে ছিল, যে সুরজিৎ ইস্টবেঙ্গলের ঘরে একাধিক ট্রফি তুলে দিয়েছে, যে সুরজিৎ ইস্ট-বেঙ্গলকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতে শিখেছিল, আজ তার সঙ্গে এই ব্যবহার। সুরজিৎকে আমি যতটা জানি, ওর একটাই দোষ — অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে জানে না।

আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছিলাম, হরজিন্দার, মনজিৎ, গুরদেবকে ইস্টবেঙ্গলে আনার কোনো দরকার ছিল না। মনজিৎ আমার চেয়েও বয়সে বড়। ওরা বলে, মনজিৎ তরুণ খেলোয়াড়। গুরদেবের মতো খেলোয়াড় কলকাতার ঘরে ঘরে আছে। আর হরজিন্দার ন্যাশনালে যতই ভালো খেলুক, কলকাতার লীগ খেলার যোগ্যতা ওর নেই। একথা আমি এখনো বলছি। কী দরকার ছিল ওদের নিয়ে আসার?

ওরা বলেছে, সুরজিৎ পলিটিক্স করছে। আমি বলি, সুরজিতের পলিটিক্স করার দরকার নেই। ও জাত খেলোয়াড়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিসের মোহে সুরজিতের চেয়ে হরজিন্দারদের প্রশ্রয় দিয়েছে সেটা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা বারবার সমর্থকদের বোঝাতে চেয়েছেন—সুরজিতের জন্যই ইস্ট-বেঙ্গলের এই অবস্থা। অন্ধ সমর্থকরা একবারও বুঝতে চাইবেন না, উনত্রিশ সালেই সুরজিৎ ক্লাবের কাছে খারাপ হল কেন? আসলে, শতবছরে ক্লাবের মধ্যে এত অন্যায় ঘটনা ঘটেছে এবং তিন পাঞ্জাবীকে নিয়ে একশ্রেণীর কর্মকর্তা এত বাড়াবাড়ি করেছেন, যার বিরুদ্ধে সুরজিৎ প্রতিবাদ করেছে। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা নাকি অন্যায়? এবং কেউ যদি বলে থাকে, সে হয়ে যাবে ওঁদের শত্রু। কিন্তু কে অধিকার দিয়েছে ওঁদের, খেলোয়াড়দের অপমান করার? ওঁরা মিণ্টুকে তাড়িয়েছেন একই অজুহাতে। ওঁরা তরুণ বসুকে অশালীন কথা বলেছেন—তরুণ মুখের ওপর সত্য কথা বলেছিল বলে। ওঁদের চেয়ে খেলোয়াড়দের সম্মান অনেক বেশী।

অনেক বছর পরিশ্রমের পর সুরজিৎ যে সম্মান পেয়েছে, ওঁরা সেই সম্মানকে নষ্ট করতে চাইছেন। কোনো কারণে কোনো খেলোয়াড়কে কর্মকর্তাদের ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু তা বলে সেই খেলোয়াড়কে অসম্মান করার অধিকার কর্মকর্তাদের নেই। যে কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের বিচারের ভার নিজের হাতে নিয়েছেন, তাঁদেরতো অজস্র অন্যায় কার্য-কলাপ রয়েছে, সেই বিচার কে করবে?

আজ ক্লাবের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার জন্য নব্বুইভাগ দায়ী এইসব কর্মকর্তারা। কিন্তু ক্ষমতায় থাকার লোভে সব দোষ সুরজিতের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। কিন্তু সেই দোষ চাপানোর খেলায় বেশীদিন খেলা যায় না।

আমি আশা করছি, সুরজিতের সতীর্থ খেলোয়াড়রা যদি মনে করে সুরজিতের ওপর অন্যায় ব্যবহার হয়েছে বা সুরজিৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে, তাহলে তাদেরও এক সঙ্গে চলা উচিত।

বিদেশের ফুটবল

পশ্চিম জার্মানি থেকে **জি সি দাস**

সম্প্রতি "ব্রাজিলিয়ান স্পোর্টস কনফেডারেশন"-এর পরিবর্তে "ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন" গঠিত হয়েছে। ফুটবলের উন্নতি এবং আগামী বিশ্বকাপ জয় করবার উদ্দেশ্যে ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ম্যানেজারকে সমস্ত সময় খেলোয়াড়দের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে 'ফুলটাইম ম্যানেজার' হিসাবে থাকতে হবে এবং তিনি অন্য কোন ক্লাব বা সংস্থার সাথে যুক্ত থাকতে পারবেননা। বর্তমানে ব্রাজিলের ম্যানেজার ক্লদিও কুটিনহো তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। মারিও জাগালো। যিনি ১৯৭০ এবং ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ম্যানেজার ছিলেন, সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে রিওর চ্যাম্পিয়ন ফ্লামিনেন্সের সাথে আবার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

পেলে বর্তমানে ফিল্ম প্রতিষ্ঠার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রথম বই "পেলে অ্যাণ্ড দি লিটল পিকপকেট স" মুক্তির সাথে সাথেই বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তিনি ফুলটাইম ম্যানেজার নিয়োগের পক্ষপাতী এবং কুটিনহোর ফুটবলকৌশলের বিরোধী। তাঁর মতে, কুটিনহো সম্প্রতি বিশ্বকাপে এবং আমেরিকান কাপে খুবই ডিফেন্সিভ খেলা খেলিয়েছেন। অন্তত রিভেলিনো এবং নেলিনহোকে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলানো উচিৎ ছিল কারণ ওরা এই দু'জনকে যথেষ্ট ভয় করে। পেলে সর্বদাই আক্রমণাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন পৃথিবীর যে কোন দলের বিরুদ্ধেই ব্রাজিলের আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে খেলা উচিৎ। রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে খেলে পরাজয় বরণ করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। তার মতে রুচীর এবং প্রাণবন্ত ফুটবল খেলা হবে তখনই যখন খেলাটি হবে আক্রমণাত্মক।

এছাড়া পেলে আরও বলেন যে বর্তমান ব্রাজিল দলে সুইপার কার্লোস আলবার্টো অপরিহার্য। কার্লোস আলবার্টো বয়স্ক খেলোয়াড় হলেও গত সীজনে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম ছিলেন। আর ফ্রান্সিসকো মারিনহোকে আনা উচিৎ কারণ এর মত খেলোয়াড় ব্রাজিল জাতীয় দলে বেশি নেই।

ফুটবল সংস্থার বর্তমান কর্তারা ব্রাজিলের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন এবং জাতীয় দলের উন্নতির জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন।

আগামী বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দল

ট্রেনার সীজার মিনোত্তি আগামী বিশ্বকাপের জন্য নিম্নলিখিত দল গঠন করেছেন।

ফিল্লোল, লুকে, পাসারেল্লা, ওরটিজ, রেমন দিয়াজ (রীভার প্লেট দলের); বেলি, ভিল্লাভারদে, ছেন, বিভিনি, ওতেগ (ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের), তারানতিনি, অজিহেদো, গ্যালেগো, ব্রাভো, বোকানেগ্রা, ভ্যালেন্সিয়া (হুরাকেন দলের), অ্যা'ডই এবং ক্রিমন্টি (সানলোরেঞ্জো), কারাডেজি এবং নিয়েগো মারাদোনা (আর্জেন্টিনোস জুনিয়রস), সিমোন এবং গ্যারেলো (বকা জুনিয়র্স), মারবান এবং কাস্তেয়ানো (রেসিং ক্লাব), ইশা এবং এস্কুদেরো (ভেলেজ সারসফিল্ড), জ্যান ফুজেন (রোজারিও সেণ্ট্রাল), হার্ণতেজ (রিভারপ্লেটে)। মিনোত্তি উপরোক্ত খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিয়েছেন, বিনা অনুমতিতে তারা দেশের বাইরে কোনও ক্লাবে যোগদান করতে পারবেন না। বিদেশে যে সব খেলোয়াড় খেলছেন যেমন— মারিও কেম্পেস, অসভালদো আর্দিলেস, বারতোনি, রিকা—এঁদের কাউকেই তিনি প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করেন নি। যদিও বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জয়ের মূলে কেম্পেস, আর্দিলেস আর বারতোনির দান অবিস্মরণীয় তবুও এঁদের বাদ দিতে তাঁর হাত একটুও কাঁপে নি।

টুকরো খবর

পোল্যাণ্ডের ম্যাক্স ব্রোজাসিয়েক তাঁর নিজের দেশে ১৯৭৯ সালের 'শ্রেষ্ঠ' খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। এবং দ্বিতীয় স্থানে আছেন পোল্যাণ্ডের রাইট আউট গ্রেগোরজ লাটো।

● ● ●

সাউথ আফ্রিকার ফুটবলার কেনেথ মোকোআওয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ডিপ্লোম্যাটস দলে যোগদান করার পরে সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, তিনি বারে গিয়ে প্রচুর মদ্যপান করলে একদল লোক তাকে মাথায়, বুকে, পায়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। তার অবস্থা এখন আশংকাজনক। তার ফুটবল খেলার এখানেই সমাপ্তি ঘটবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

● ● ●

জুরিখ ফুটবল ক্লাবের চেয়ারম্যান মিঃ নাগেলি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৭ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর সময়ে জুরিখ এফ সি দল ছ'বার সুইজারল্যাণ্ড লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর পাঁচবার এফ এ কাপ জয় করেছে।

● ● ●

ইটালীর ম্যানেজার এন্‌জো বিয়ারজোত বলেছেন যদি ইটালী আগামী জুন মাসে রোমে আয়োজিত ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করে, তবে তিনি ফাইনালে পরাজিত দলের ম্যানেজারকে একটা অবশিষ্ট ইউরোপ দল গঠন করতে বলবেন। ফাইনাল খেলার চারদিন বাদে রোম অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ইটালী বনাম অবশিষ্ট ইউরোপীয় একাদশের খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে।

● ● ●

যুগোস্লাভিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ফ্রানজো মাতোসিকের ৬০ তম জন্মদিন উপলক্ষে তাকে একটি সোনার ঘড়ি আর ফুল উপহার দেওয়া হল জাগরেবে স্টেডিয়ামে। এই পুরস্কারটি বিতরণ করা হল হাজদুক বনাম জাগ্রেব দলের লীগ খেলার আগে। সমস্ত স্টেডিয়ামের লোক তাকে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানালেন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। ইনি হাজদুক স্প্লিট দলের পক্ষে ৭৩৯টি খেলায় ৭২২টি গোল করেছিলেন।

● ● ●

স্পেনের রেইত ভ্যালেকানো প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দিয়ে উরুগুয়ের সুপার স্ট্রাইকার ফারনান্ডো মোরেনাকে নিয়ে বিশেষ লাভবান হয়েছে। মোরেনা শুধু যে দর্শনীয় গোল দিয়েই দর্শককে আনন্দ দিয়েছেন তাই নয় উপরন্তু মাত্র দুটি খেলাতেই ক্লাব প্রায় আশী লক্ষ টাকা 'গেট-মানি' পেয়েছে।

মাত্র একটি প্রশ্ন

ক্যালেন্ডার প্রাইভেট থাকে পাঠক-পাঠিকাদের, কিন্তু ক্যালেন্ডারটি আজকাল তো নেই এই পত্রিকায়। তাই প্রশ্নোত্তরের একটি আসর খোলার সময় কিছু কথা বলে নিতে চাই। প্রথমত, একটির বেশী প্রশ্ন করবেননা। দ্বিতীয়ত, "মাত্র একটি প্রশ্ন" এই শিরোনামে চিঠি দেবেন পোস্ট কার্ডে। তৃতীয়ত, মনে রাখবেন যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু নির্বাচিত প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

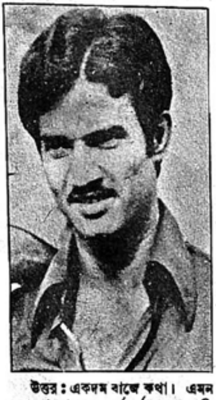
এই বিভাগে, প্রয়োজন হলে এবং সম্ভব হলে অন্য বিশিষ্ট সাংবাদিকদেরও আনা হবে। আগামী কয়েকটি সংখ্যার জবাব দেবেন অশোক দাশগুপ্ত।

সত্যি ?

(একটি অভিনব বিভাগ—'সত্যি ?' নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে কতো কথাইতো রটে। তার কতোটা গুজব কতোটা সত্যি, আপনারা নিশ্চয় জানতে চান। এই ধরণের কিছু প্রশ্ন খেলোয়াড়দের কাছে আমরা রাখব। আপনারাও কোনো গুজব বা রটনা বা ঘটনার কথা জানাতে পারেন। তার কতোটা সত্যি—জবাব দেবেন স্বয়ং সেই খেলোয়াড়)

গৌতম সরকার

গত তিন বছর ধরেই শোনা গেছে যে আপনি ইস্টবেঙ্গলে ফিরে আসছেন। এবার ইস্টবেঙ্গলের এক অতি বিশিষ্ট কর্তা জানালেন, আপনি নাকি বলেছিলেন, মানস—বিদেশদের নিয়ে আসতে পারি। তবে সেসব পরের কথা। কিন্তু প্রথম কথা হল, সুরজিৎ সেনগুপ্তকে রাখা চলবেনা।" একথা কি তাহলে সত্যি যে সুরজিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে এক টীমে খেলতে আপনি রাজী নন ?



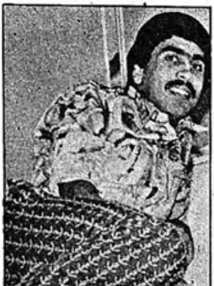
উত্তর : একদম বাজে কথা। এমন কথা কোনো কর্মকর্তাকে আমি বলিনি। সুরজিৎ আমার খুব প্রিয় পাত্র। দুজনে থাকি কলকাতার দুই প্রান্তে, তাই দেখা হয় কম। কিন্তু ওর প্রতি আমার ভালবাসা আছে কিনা ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। আবার এক টীমে খেলার সুযোগ হলে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হব।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

সত্যজিৎ মিত্র

আপনি এবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, টীমের অনেকেই অন্য শিবিরে চলে গেছেন, যাতে আপনার কিছু করার ছিলনা। যতদূর জানি, যারা গেছেন তাদের সঙ্গে মতের দিক দিয়ে আপনার কোনো অমিল ছিলনা। অর্থাৎ, আপনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন ঐ বিক্ষুব্ধ ফুটবলাররা টীমে থাকুক।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের এক মাঝের সারির কর্মকর্তা নাকি বলেছেন, কোয়েম্বাটোরে সন্তোষ ট্রফি চলার সময়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে প্রেমনাথ ফিলিপের সঙ্গে আপনি কথাবার্তা বলেছেন। সেক্ষেত্রে, চিন্ময়কে হারানোর ব্যাপারটা কি আপনি ধরেই নিয়েছিলেন ? তারও আগের প্রশ্ন, আপনি কি সত্যিই ফিলিপের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন ?



উত্তর : চিন্ময়দের হারানোর কথা ভাবিনি। গুজবটা আমার কানেও এসেছে। তবে পরিষ্কার জানাচ্ছি, কোয়েম্বাটোরে বা অন্য কোথাও প্রেমনাথ ফিলিপের সঙ্গে টীমে ত' ব্যাপারে একটি কথাও বলিনি।

সত্যজিত মিত্র

সুব্রত ভট্টাচার্য

জানিনা গুজব না সত্যি। তবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রের খবর এই যে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে আপনি রয়েড স্ট্রীটের মোহনবাগান মেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সাধারণত আপনি ওখানেই থাকেন, মাঝে মধ্যে যান শ্যামনগরে নিজেদের বাড়িতে। কিন্তু ঐদিন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে আপনি মোহনবাগান মেস ছেড়েছিলেন যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে। এটাও জোর দিয়ে বলা যায় যে তারপর বেশ কয়েকদিন আপনাকে মোহনবাগান মেসে দেখা যায়নি। এমনকি, আপনি নাকি আপনার প্রিয় মোহন-বাগান ক্লাব ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন।

পরে হয়তো সব মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, ব্যাপারটা কি সত্যিই ঘটেছিল ?



উত্তর : সত্যি, আপনাদের চোখ এড়িয়ে কি কিছুই করার উপায় নেই ? একটা ব্যাপারে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই ক্লাবের মেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

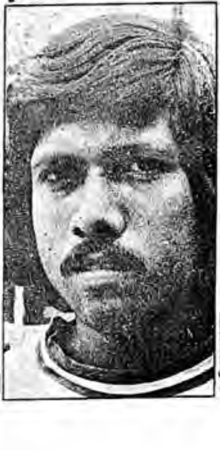
সুব্রত ভট্টাচার্য

ভারত কি সত্যিই ভাল খেলেছে?

সুভাষ ভৌমিক

ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ বাসা বলেছেন, সিঙ্গাপুরে প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে ভারত ভাল খেলেছে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অন্য দু'তিনটি দেশের কোচের প্রশংসোবাণীও উদ্ধৃত করেছেন। সিঙ্গাপুরফেরত দু'একজন খেলোয়াড়ের মুখেও শুনলাম, টীম ভালই খেলেছে। ভারতীয় দলের একজন প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে আমার মনে কিন্তু কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জাগছে।

কোন্ হিসেবে বলা হচ্ছে যে ভারতীয় দল ভালই খেলেছে? কোচ বাসার কথায় বাস্তব মনে হচ্ছে, ভারতের বিরুদ্ধে গোলের সংখ্যা কম থাকাটাকেই তিনি সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে দেখছেন বা দেখাতে চাইছেন। উনিশশো চুয়াত্তরের এশিয়ান গেমসে চীনের কাছে ভারত হেরেছিল ৭—১ গোলে। এবার প্রথম ম্যাচেই সেই চীনের কাছে ভারত যখন নামমাত্র এক গোলে হারল, এত দূরে বসেও ভারতীয় দলের খেলা সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা করে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখা গেল, সব খেলাতেই ঐ দু'-এক গোলে হেরে



চিত্তরঞ্জন পাহাড়ি

যাচ্ছে ভারত। কোরিয়া বা ইরানের কাছে হারের মানে বুঝি, কিন্তু সিঙ্গাপুরের কাছেও ভারতকে হারতে হল কেন? এইতো দু'বছর আগে মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে সিঙ্গাপুরে খেলে এলাম। ভারতের জাতীয় পর্যায়ের দল ওদের হারাতে পারবনা কেন?

মাত্র একটি খেলায় ভারত জিতেছে। শ্রীলঙ্কাকে ভারত হারিয়েছে ৪—০ গোলে। এই শ্রীলঙ্কা বাকী পাঁচটি ম্যাচে হজম করেছে ২৮ গোল। ম্যাচপ্রতি গড়ে ৫·৬ গোল।

বোঝাই যাচ্ছে, ভারতীয় দল খেলেছে গোলের সংখ্যা কম রাখার উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে। তাহলেই যদি খেলে থাকে ভারত, প্রায়



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সব ম্যাচে পুরোপুরি খেলতে হল কেন গোলকীপার ভাস্কর গাঙ্গুলীকে? গোলকীপার অবশ্যই টীমের অপরিহার্য অংশ, তাই তাকে খেলতেই হবে। কিন্তু পাঁচটির মধ্যে চারটি ম্যাচে তাকে যদি প্রাণপণ লড়তে হয়—সেই টীমের সামগ্রিক খেলা সম্পর্কে প্রশ্ন না জেগে পারেনা।

প্রি-অলিম্পিক ফুটবলের খেলাগুলো দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তাই বলতে পারছিনা, ভারতীয় ফরোয়ার্ড'রা বিপক্ষের গোলে ক'টা শট নিতে পেরেছে। তবে ফলাফল বলছে, শ্রীলঙ্কা ছাড়া অন্য পাঁচটি দেশের বিরুদ্ধে ভারত একটি মাত্র গোল করতে পেরেছে।

কোচ বাসা টীমকে খেলিয়েছেন চার-তিন-তিন প্রথায়। এই রক্ষণাত্মক পদ্ধতির মধ্যেও পাল্টা আক্রমণের সুযোগ থাকে। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার মানসিকতা কি বাসার ছিল? আসলে চার-তিন-তিনও নয়, তিনি খেলিয়েছেন প্রায় চার-চার-দুই প্রথায়। তিনজন ফরোয়ার্ড'রও একজনকে পিছনে রাখার পরিকল্পনা হয়তো কাজ করেছে। বলা যায়, চার-সাড়ে তিন-আড়াই পদ্ধতি।

অর্থাৎ, প্রথম থেকেই বাসা মাথায় রেখে-ছিলেন, হার হয় হোক, গোল যেন বেশি না হয়। যাতে দেশে ফিরে বলা যায়, টীম খারাপ খেলেনি।

কিন্তু, এ হল সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। হতে পারে এমুহূর্তে এশীয় ফুটবলের মানচিত্রে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু সেজন্য পুরোপুরি নেতিবাচক পথে চলাটাও সমর্থন করা যায়না।

ব্যর্থতা এবং অসাফল্যের অন্ধকার কাটিয়ে ভারতীয় ফুটবলের মানের উন্নয়ন ঘটাতে হলে, চাই ইতিবাচক চিন্তা। জিততে গিয়ে হেরে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু প্রথম থেকে কম গোলে হারার জন্য খেলার কোনো যুক্তি নেই।

উনিশশো বিরাশির এশিয়ান গেমস দিল্লিতে হবে। এখন থেকেই সেজন্য উপযুক্ত কোচের নেতৃত্বে প্রস্তুত হওয়া দরকার। কে উপযুক্ত কোচ? খোলাখুলিই বলি, ভারতে এই কাজের যোগ্যতম লোক পি কে ব্যানার্জী।



সুনীল গাভাসকার পদত্যাগ করলেন কেন ?

শিবাজী দাশগুপ্ত

এই প্রশ্নটি ভারত বনাম পাকিস্তানের পঞ্চম টেস্টের পর থেকেই সুনীল গাভাসকারকে করবার চেষ্টা করেছেন একাধিক সাংবাদিক। কিন্তু মনের মতন উত্তর তাঁরা কেউই পাননি। গাভাসকারের সরকারী বিবৃতি ছিল, "আমি যেহেতু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাবনা, সেহেতু একজন নূতন অধিনায়ককে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার সুযোগ করবার জন্য পদত্যাগ করলাম। কলকাতার ষষ্ঠ টেস্ট বা জুবিলি টেস্টে নির্বাচিত হলে নিশ্চয়ই দেশের প্রতিনিধিত্ব করব।"

গাভাসকারের কলকাতায় অবস্থিতির সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাহায্যে কারণটি বার করবার চেষ্টা করেছি। সরাসরি কোন উত্তর পাওয়া যায় নি, তবু নানা রকম টুকরো ও ছেঁড়া ঘটনার বিবরণ একত্রিত করে যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটেছে তাই তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। এর পিছনে কতখানি অনুমান কতখানি অতিরঞ্জিত বিবরণ তা সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

বোর্ডের সঙ্গে গাভাসকারের মন কষাকষি কালীচরণের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমের সফর থেকেই। প্যাকার প্রসঙ্গ নিয়ে হৈ চৈ হওয়ায় গাভাসকার অধিনায়কের পদ হারান। '৭৯ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে গাভাসকারের ভূমিকা সাধারণ খেলোয়াড়ের মাত্র। '৭১, ৭৪ ও '৭৯ এই তিন বছরের পারফরমেন্সএর তুলনা করলে '৭৯ সালকেই গাভাসকারের ইংল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ খেলা বলে মেনে নিতে হয় তবুও বোর্ড চরম কোপ মারবার ফাঁক ফোকর খুঁজছেন। কিন্তু ২২১ রানের ইনিংসটি সব সুযোগকে নিজীব করে দিয়ে যায়। ওভাল টেস্টে শেষদিন খেলা আরম্ভের আগে গাভাসকার অপরাজিত ৪২। তখনও বোর্ড সজাগ গাভাসকারের টেস্ট জীবন শেষ করবার ব্যাপারে। হাতেও মোটামুটি একটা অজুহাত ছিল। বিদেশী প্রেসকে গাভাসকার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "যে হারে আমরা টেস্ট ম্যাচ খেলছি তাতে পাকিস্তান যখন ভারতে এসে পৌঁছাবে তখন আমরা এত পরিশ্রান্ত থাকব যে তারা হয়ত আমাদের একেবারে গুঁড়িয়ে দেবে।" এই বিবৃতির সূত্র ধরেই গাভাসকারকে শেষ করবার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল। সুনীলও তা জানতেন কারণ ঐ ওভাল টেস্টের শেষ দিনে ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর উক্তি, "সম্ভবত জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংস খেলতে যাচ্ছি, যদি না বিরাট কিছু করতে পারি। কিন্তু পারব কি? বুকে একটা যন্ত্রণা ভীষণ বেগ দিচ্ছে।" কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের সৌভাগ্য সুনীল অসাধারণ নৈপুণ্যে ভরা ২২১ রানের ইনিংসটি খেলে ভারতকে এক অসম্ভব জয়ের মুখে নিয়ে এসেছিলেন।

তারপরেই চাকা ঘুরল। বোর্ড যাকে ফকির বানাতে চলেছিলেন। তাঁকেই রাজা বানালেন। বেচারী বেঙ্কট। ইংল্যাণ্ড সফরে মোটামুটি ভাল অধিনায়কত্ব করেও ফিরতি প্লেনে তাঁর মুকুট কেড়ে নেওয়া হল। গাভাসকার শুধু অধিনায়কই হলেননা, হলেন ভারতীয় দলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাবিশেষ। দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সফল নেতৃত্ব দিলেন গাভাসকার। ২-০ ম্যাচে ভারত নিজের দখলে রাবার রাখল। প্রথম চারটি টেস্ট শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে কাটালেও অধিনায়ক গাভাসকার আবার বোর্ডের বিরোধিতার বলি হলেন। পঞ্চম টেস্টের প্রাক্কালে কলকাতায় এসেছেন গাভাসকার। হঠাৎ হোটেলে টেলিফোনের আওয়াজ। অপর প্রান্তে বোর্ডের এক বিশিষ্ট কর্মকর্তা। বললেন "আশাকরি তুমি জানো যে ভারতীয় দল ঠিক পাকিস্তান সিরিজের পরেই বা সঠিকভাবে জুবিলি টেস্টের পরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাচ্ছে! নিজেকে প্রস্তুত রেখো। গাভাসকার উত্তরে জানালেন, "আমি এই সফরের ব্যাপারে আদৌ কিছু জানি না। তবু আপনার ও আপনার টিমের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।" বোর্ড কর্মসচিব এই জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পারলেও পাকিস্তান সিরিজে গাভাসকারকে অধিনায়কের পদ থেকে সরাবার সাহস তাঁর ছিলনা।



গাভাসকার এরপর অসন্তোষের আগুনে পুড়েছেন। কখনই স্বস্তি পাননি। পাকিস্তানের সঙ্গে জিতবেন এমন আশা তিনি প্রথমে করেন নি। কিন্তু বাঙ্গালোরে প্রথম টেস্ট থেকেই তিনি ধরতে পেরেছিলেন যে প্যাকিস্তান ব্যাটসম্যানেরা মারকুটে মেজাজ ছাড়তে পারেন নি এবং বোলিং-এ একটু চাপ সৃষ্টি করতে পারলে হয়ত তাঁরা ভেঙে পড়বেন। তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় নি। পাকিস্তান চূড়ান্ত ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে প্রথমে বোম্বেতে, তারপর মাদ্রাজে হারে। রাবার ২—০ দাঁড়িয়ে যাওয়ায় গাভাসকার মনে করলেন যে তাঁর দেশের প্রতি কর্তব্য ঠিকই করেছেন। আর যেখানে একান্ত অসহায় অবস্থায় বোর্ড তাঁকে বহাল রেখেছেন সেখানে আর ঐ অসম্মানের বোঝা টানবার দরকার কি?

ঐ পদত্যাগ এমন আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে বোর্ড সভাপতি বলেই বসলেন যে গাভাসকার কি নিজেকে অপরিহার্য বলে মনে করেন? মোটামুটি এই হল গাভাসকার-বধ কাহিনী। এখন যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে এই পদত্যাগ উচিৎ কি অনুচিৎ তা নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়াস এখানে নেই। এর জবাব পাঠকরাই দেবেন।

আবোল তাবোল

জুবিলি টেস্ট শেষ হবার ঘন্টা তিনেক পরেই ক্রিকেট লেখক ভিকি রজাগরের সঙ্গে দেখা। অগোছালো পিজ্জাটা হিপ পকেটে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়েস?'

—'একটা ইণ্টারভিউ।'

—'অফ কোর্স। কিন্তু আমার সঙ্গে?'

—'ইয়েস, মিঃ রজাগর, আপনি কত সালে ক্রিকেট রিপোর্টিং শুরু করেন?'

—'সুনীল গাভাসকারের জন্মের আট বছর পরে।'

—'চমৎকার জবাব। আচ্ছা, আপনার দেখা সেরা টেস্ট ইনিংস কোনটি?'

—'ওভালে সানির দুশো একুশ নিশ্চয় নয়। ওর চেয়ে ঢের ভাল ইনিংস দেখেছি।'

—'সত্যি, নিখুঁত জবাব। আচ্ছা, আপনার মতে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান কে?'

—'নিশ্চয় সানি নয়।'

—'বেশ বেশ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বোম্বে টেস্টে ভারত জেতার পর বোম্বে এবং দিল্লির দুটি কাগজে আপনার দু'রকম বক্তব্য পড়েছি। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন মিঃ রজাগর?'

—'দুটি টেস্টেই ভারত সানির ক্যাপ্টেনশীপের জন্য নয়, সানির ক্যাপ্টেনশীপ **সত্ত্বেও** জিতেছে। দিল্লি আর বোম্বের কাগজে দু'রকম রিপোর্টের জন্য দুঃখিত। আসলে লণ্ডনের কপিটা ভুল করে দিল্লিতে চলে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, 'ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী ভারতীয় সাংবাদিক' হিসেবে ভারতকে বৃটিশ কাগজে যথাসম্ভব হেয় করার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছেই। তাই ডেইলি টেলিগ্রাফের কপিতে ইণ্ডিয়ান আম্পায়ারদের শ্রাদ্ধ করেছিলাম। ভুল করে কপিটা দিল্লিতে —।'

—'বুঝেছি বুঝেছি। মাদ্রাজ টেস্টেও ভারত জিতেছে। সানির ব্যাটিং-এর **জন্য** নয়, সানির ব্যাটিং **সত্ত্বেও**—। কী বলেন? যাকগে, ক্যালকাটা টেস্টে আসিফের ডিক্লারেশন সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

—'আসিফের ডিক্লারেশন সম্পর্কে অনেক কথা বলা-লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু যেভাবে গাভাসকারের মাঠে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটা নিয়ে গভীর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই অপরাধে সানির তিনটে সেঞ্চুরি কেটে নেবার প্রস্তাবও আই সি সি বিবেচনা করতে পারে।'

—'দারুণ দারুণ। জুবিলি টেস্টে বথামকে কেমন লাগল?'

—'বথামকে আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু সানি নব্বইটার কাছটা সত্যিই ফেলেছে, একি অস্বীকার করতে পারেন?' হিপ পকেট থেকে জল-পিস্তল বের করে ভিকি উঠে দাঁড়ালেন।

—'কোথায় যাচ্ছেন?'

—'কে এন প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা আর্টিকেল লিখতে। একটা দারুণ তথ্য পেশ করব। তেষট্টি টেস্টে সানির তেইশটা সেঞ্চুরি নিয়ে আপনারা হৈ চৈ করেন। কিন্তু তেষট্টি টেস্টে সানি যে তেইশটা ক্যাচও ফেলেছে, সে খবর কতজন রাখেন?'

বাবুরাম সাঁপুড়ে

আমার প্রিয়



ফুটবলার	সুরজিৎ সেনগুপ্ত
ক্রিকেটার	সুনীল গাভাসকার
কোচ	অচ্যুত ঘোষ, পি. কে. ব্যানার্জি
বন্ধু	[illegible]
গায়ক/গায়িকা	মান্না দে, [illegible]
অভিনেতা/অভিনেত্রী	উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন
লেখক/লেখিকা	শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী
খাদ্য	সন্দেশ
ছবি	[illegible]
উঠতি খেলোয়াড়	সুদীপ চ্যাটার্জী

বিজন বসু

মাঠের ডায়েরী

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে খেলক সুপ্রিয় সেনকে সঙ্গী করে ঘুরেছি গোটা কলকাতা। সঙ্গে ছিল কিছু ছাপানো ফর্ম — প্রশ্নাবলী। খেলার পত্রিকার পাঠকরা কী চান, কোনটা চাননা — খুঁজে বার করার জন্য গেছি যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ক্যান্টিন থেকে শুরু করে শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডায়। গেছি বিদ্যাসাগর কলেজে, চিড়িয়াখানায়, এমনকি খিদিরপুরের হাটের দোকানেও।

যারা উত্তর দিয়েছেন, অধিকাংশই সংকোচ দূরে ঠেলেছেন। একেবারে বিপরীতমুখী উত্তরও তাই পাওয়া গেছে। একটা প্রশ্ন ছিল : মতি নন্দী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস লিখলে কেমন হয় ? অধিকাংশ উত্তরই সহজ এবং নরম : 'ভাল হয়।' একজন বললেন, 'তাহলে, ঐ একটি লেখার জন্যই আমি পত্রিকাটি নিয়মিত কিনব।' উল্টো দিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সরাসরি জবাব— 'মতি নন্দীকে বর্জন করা দরকার।'

মজার ঘটনা ঘটল পার্ক সার্কাস ময়দানে। সারা দিন ঘোরার পর প্রায়-বিকেলে পার্ক সার্কাস ময়দানে পৌঁছে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, কিছু বাচ্চা ছেলের মতামত নেওয়া যাক। আমার হাতে ব্রিফ কেস, সারাদিনের রোদে ম্লান ও শুকনো মুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় সেন ডাকলেন, "এই যে ভাই, শোনো।" একেবারে হাতে-ধরা গল্পের শুরু! ছেলে দুটিও তাই ভাবল। একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। আর একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে কোনোরকমে বলল, 'আমরা খেলার বইটই পড়িনা, শুধু স্কুলের পড়ার বই পড়ি··· আমাদের ছেড়ে দিন।"

মোহনবাগান জিন্দাবাদ !

৮ মার্চ বিদেশ বসুর বিয়ের আসরে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। অনেক নামী ফুটবলার নিমন্ত্রিত ছিলেন — সুতরাং অটোগ্রাফ শিকারীদের উৎপাতও ছিল প্রবল। যতীনবাবুকেও বেশ কিছু অটোগ্রাফ দিতে হল। ওখানে তিনি কী লিখলেন ? ইংরেজীতে সই করলেন—'লং লিভ মোহনবাগান।' বাংলায় সই করলেন—'মোহনবাগান জিন্দাবাদ।'

ঐ টীমের ···

মহমেডান কর্মকর্তারা কথা বলছেন ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ারদের সঙ্গে। আলোচনার একটা পর্যায়ে এসে মনে হল, ইস্টবেঙ্গলের সাত-আটজনও দল ছাড়তে পারেন। মহমেডান স্পোর্টিং-এর এক তরুণ কর্মকর্তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে গেল : 'তাহলে ঐ টিমটার কী হবে।"

ঐ ছেলেটি

যে পাইপয়ালা আমরা বা নথরকান্তি শাস্ত্রীর দাপট ক্রিকেট না বুঝেও টেস্ট ক্রিকেটের সময় ক্লাব হাউস আলো করে বসে থাকেন, তাদের কার্ড বা টিকিট কেড়ে নেবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু ঐ ছেলেটিকে একটি টেস্ট টিকিট আমি অবশ্যই দিতে পারি।

বিদেশ বসুর বিয়ের আসরে নিমন্ত্রিত ছিল বাংলার প্রতি ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জী। সকলে ফুটবল প্লেয়ারদের নিয়েই ব্যস্ত, সম্বরণ এককোণে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ একটি ছেলে সম্বরণের দিকে এল, ওর অটোগ্রাফ খাতায় প্রথম সইটি নিল ক্রিকেটার সম্বরণের কাছ থেকে! কিছুটা আগ্রহ লাগল। ছেলেটিকে পাশে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি জানোনা যে আশেপাশে এত নামকরা ফুটবল প্লেয়ার?"

—'হাঁ'।

—'তাহলে সম্বরণ ব্যানার্জীর সই আগে নিলে কেন ?'

—'আমি ক্রিকেট খেলা সবচেয়ে ভালবাসি, তাই।'

আগাম অভিনন্দন

সর্বভারতীয় ক্রিকেট নির্বাচক কমিটিতে রাজু কালকার আর থাকছেন না, এটা প্রায় নিশ্চিত। তাহলে পূর্বাঞ্চল থেকে কে থাকবেন ? প্রাক্তন নির্বাচক পঙ্কজ রায় সম্ভবত নন। প্রথম দিকে অম্বর রায়ের নাম শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তিনি হয়তো আগে আসবেন রাজ্য নির্বাচক কমিটিতে। তাহলে ? এক বিশেষ সূত্রের খবর, সর্বভারতীয় নির্বাচক হচ্ছেন রাজ্য নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর মিত্র। শ্যামসুন্দর মিত্র এবং অম্বর রায়— দুজনেই সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে নতুন দায়িত্ব পাবেন। আগাম অভিনন্দন থাকল।

কোথায় সুরজিৎ ?

প্রথম ফোন :" দোলের দিন বিকেলে সুরজিৎ সেনগুপ্ত কলকাতা ছেড়ে কোথায় গেলেন ?" দ্বিতীয় ফোন : "পয়লা মার্চ থেকে সুরজিৎ নাকি কলকাতাতেই মহমেডান স্পোর্টিং এর গোপন আস্তানায় ?" দেখা হতেই এক খনিষ্ঠ বন্ধু : "আচ্ছা, সুরজিৎ নাকি নর্থ বেঙ্গলের এক চা-বাগানের অফিসার বাংলোয় আছে ?" এক জুনিয়র ফুটবলার : "সুরজিৎদা নাকি আপনার বাড়িতে লুকিয়ে ?

মার্চের প্রথম সপ্তাহে এত জিজ্ঞাসার জবাবে শুধু হেসেছি। আসলে সুরজিৎ তখন ভারতের বাইরে।



এসো আমরা ফুটবল খেলি

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই শুরু হচ্ছে একটি প্রতীক্ষিত রচনা—'এসো আমরা ফুটবল খেলি।' অল্পবয়সী ফুটবলারদের সহজ ক'রে ফুটবল খেলানোর চেষ্টা করবেন ছোটদের বড়দের সকলের প্রিয় ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

এখন বিশ্রাম, এখন চিন্তা

বাবু প্যাটেল

অনেক জল ঘোলা করার পর ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর পরিত্যক্ত হল। সুনীল গাভাসকার এবং কপিলদেব এমনিতেই যেতেন না, সফর বাতিল করার জন্য প্রভাবশালী রাজনীতিকেরা সক্রিয় হচ্ছিলেন—কিন্তু মজার কথা হল এই যে তীরটা ছোঁড়া হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিক থেকেই। ওঁরা জানিয়ে দিলেন, একমাত্র সেরা দলকেই পেতে চান, সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সফর বাতিল করাই যুক্তিযুক্ত। ইংল্যাণ্ড সফরের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটারদের বিশ্রামের কথাটাও অবশ্য সৌজন্যের খাতিরে উত্থাপিত হল। সুনীল গাভাসকারবিহীন ভারতকে গ্রহণ করতে অন্তত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নামক দেশের ক্রিকেট বোর্ড যে রাজী হবেনা, এটা মিঃ চিদাম্বামীর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির বোঝা উচিৎ ছিল। তাছাড়া, ক্রমাগত টেস্ট ম্যাচের ফলে ক্রিকেটার এবং দর্শকরা সমভাবেই ক্লান্ত—তুবিবিধ টেস্ট নিশ্চয় সেটাও প্রমাণ করে দিয়েছে।

এই বছরের শেষের দিকে ভারত অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম ক্রিকেটারদের ভাগ্যে নেই, ঘরোয়া ক্রিকেট আছে। তবে টেস্ট ক্রিকেটের টেনশন থেকে কয়েক মাসের জন্য মুক্তি তো বটেই। এই অবস্থায়, ভারতীয় ক্রিকেটারদিকেরা নিশ্চয় একবার খাতাপত্র খুলে বসবেন, ভবিষ্যতের কথা ভাববেন।

কপিলদেব এবং অংশু গাইকোয়াড়ের সাফল্য যে চমকপ্রদ তা বহুকণ্ঠে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকে সেভাবে চোখকানে দেখা হয়নি। বেদী-চন্দ্র-প্রসন্ন-বেঙ্কট যে অর্থে স্পিনের স্বর্ণযুগ এনেছিলেন, সেই অর্থে কপিল-কারসন পেস বোলিং-এর সোনার সময় এনে ফেলেছেন বা ফেলতে পারেন—এমন বাড়াবাড়ির মধ্যে আমি নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের একটি অভাব ওরা পূর্ণ করেছেন, এই পর্যন্ত। কিন্তু স্পিনের যাদু যে প্রায় নিশ্চিহ্ন, এই চিন্তাটা যেন আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। দোশী ওস্তাদ ভাড়মেনশনাল বোলার, নিপুণ কিন্তু সীমাবদ্ধ। দোশীকে দিয়ে যদি বা কাজ চালানো যায়, চন্দ্র-প্রসন্ন-বেঙ্কটের বিকল্প কোথায়? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে শিবলাল যাদবকে বসানো নিয়ে সানির বিরুদ্ধে বেশ কিছু কলম শানানো হয়েছে, কিন্তু যাদব কি নিজের অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন? শিবলাল নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতিবান অফ স্পিনার, কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটের জোরালো গোপাল শর্মা, আরশাদ আয়ুব প্রমুখ আরো কিছু উদীয়মান অফ স্পিনারের দিকে নজর রাখার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এবং অপ্রিয় সত্য হল এই যে এখনও ভারতের এক নম্বর অফ স্পিনার শ্রীনিবাস বেঙ্কট রাঘবন। বয়স তাঁর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নয়, কেননা ভেঙ্কট এখনও শারীরিক দিক দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ তৎপর ও সক্ষম রেখেছেন। লেগ স্পিনার পরমজিৎ সিং-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন মুস্তাক মহম্মদ। এই তরুণ লেগ স্পিনারকে অতি শীঘ্র টেস্ট ক্রিকেটের কাছাকাছি তুলে আনা দরকার। হরবিন্দর সিং বেদী সম্পর্কে প্রত্যাশা কিছুটা গুটিয়ে ফেলতে হচ্ছে, হতাশা যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।



দ্বিতীয় প্রশ্ন, কপিল-গাইকোয়াড়ের পর তৃতীয় পেস বোলার কে? কার্স্টন চেঞ্জ বোলারের কথা বলছিনা—যে দিক দিয়ে বোলার নিতে উপযুক্ত। আমি বলতে চাইছি, কপিল বা কারসন আহত বা অসুস্থ হলে বোলিং শুরু করবেন কে? এই প্রশ্নটিরও সদুত্তর খুঁজে বের করা দরকার। তাছাড়া, কারসন ঘাউড়ির টেস্ট জীবন কত দীর্ঘ হবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন যোগরাজ সিং, কিন্তু হরিয়ানার এই তরুণকে তুলেও যাওয়া হয়েছিল অন্যায়ভাবে, তাড়াতাড়ি তুলে আনার চেষ্টাও স্বাস্থ্যকর নয়। সুনীল ভালসন দ্রুত উঠে আসছেন তবে এখনও পরিণত নন। অস্ট্রেলিয়া সফরের সুযোগ হয়তো তাঁকে পরিণত করতে পারে।

চেতন চৌহান আরো কয়েকটি টেস্টে কাজ চালালেও, ভারতকে অবিলম্বে একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান তুলে আনতে হবে। রোজার বিনিকে তিন নম্বর হিসেবে ভাবাই ভাল। সাম্প্রতিক কালের চেয়েও এ ব্যাপারে তরুণ পার্কারের দাবী প্রবল। গুলাম পার্কার ক্রিকেট-এর বাছাই পার্কারের মতোই অসাধারণ।

যশপাল শর্মা এবং বেঙ্গসরকার – দুজনেই প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতে জানেন, কিন্তু স্কোরবোর্ডকে সর্বদাই সচল রাখবেন এমন আর একজন দ্রুত অর্থাৎ বাউণ্ডারি-স্পেশালিস্ট চাই। সুরিন্দর অমরনাথ এবং ব্রিজেশ প্যাটেল হতাশ করার পর আপাতত এই প্রশ্নের একটাই উত্তর: শ্রীনিবাসন। অনুভূতি এই যে, বেঙ্কটরাঘবনের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই তামিলনাড়ুর এই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানকে খাদপ্রদীপের আলোয় আসতে দেয়নি। দক্ষিণাঞ্চলের ক্রিকেট-কর্তারাও কি শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে?

এবং এই কয়েক মাসের অবসরে, আর একটি চিন্তা আমাদের পীড়িত করবে। ব্যাটিং যার স্পর্শে মধুর সঙ্গীত বা নৃত্যশিল্পে পরিণত, সেই গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ কি সত্যিই অস্তাচলে?

পাঠকের জন্য

এবং অবশ্যই, পাঠিকারও জন্য। 'পাঠকের জন্য' বিভাগে প্রকাশিত হবে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি, মতামত। কাগজের এক দিকে পরিষ্কার করে লিখবেন। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করলেই ভাল হয়। শুধু আমাদের প্রশংসা নয়, গঠনমূলক সমালোচনাও চাই। বিশেষ কোনো পরামর্শ বা বক্তব্যও রাখতে পারেন। সবচেয়ে বেশি মনে রাখবেন একটা কথা, সব চিঠি যে প্রকাশ করা সম্ভব তা নয় – তবে সব চিঠিই আমরা মন দিয়ে পড়ব, চিঠির বক্তব্য মাথায় রেখে এগোব।

বাংলা হারল, বাংলা লড়ল

ফাইটার

বাংলা-দিল্লি রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে ২২৮ রানে বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যাবার সময় অন্যতম নির্বাচক শিবাজী বসু মন্তব্য করলেন, "হুঁ, এরা আবার টেস্ট খেলবে !"

এই মন্তব্যের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, বাংলার কোনো ব্যাটসম্যানের টেস্ট খেলার ব্যাপারে দাবী তোলা হয়েছে কি ? গত কয়েক বছরে বাংলার দু'জন বোলার (অলোক ভট্টাচার্য ও বরুণ বর্মণ) এবং একজন উইকেটকিপারের (সম্বরণ ব্যানার্জী) জন্য আমরা কিছু হৈ চৈ করেছি বটে, কিন্তু সর্বভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলীতে পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি তাতে উৎসাহিত হননি। বাংলার ছেলেরা খারাপ খেললেই বাঁকা মন্তব্য 'এরা আবার টেস্ট খেলবে।' কিন্তু ভাল খেললেও তাদের সামনে টেস্টের দরজা খুলে যায় কি ?

কয়েক বছর আগের কথা। যোগ্যতা সত্বেও গোপাল বসুকে ভারতীয় দলে নেওয়া হয়নি। এই সময়েই একটি বিদেশী দলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের খেলা। গোপাল খেলতে চাইলেন না। পূর্বাঞ্চল-প্রেরিত সর্বভারতীয় নির্বাচক গোপালকে বললেন, "এই ম্যাচে একটা সেঞ্চুরি করে সবাইকে দেখাও যে তুমি যোগ্য।" গোপাল নাকি ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "ধরুন আমি একটা সেঞ্চুরি করলাম। আপনি কথা দিতে পারেন, তারপরই আমাকে টেস্টে খেলানো হবে?" নির্বাচক ভদ্রলোক চুপ করে যান। গোপালও আর ঐ ম্যাচে খেলেন নি।

তবে এত কথা লেখার মানে এই নয় যে বাংলার প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ক্ষমার যোগ্য। ঘরোয়া ক্রিকেটে যারা সুব্রত গুহ, সমর চক্রবর্তী, সুব্রত পোড়েল আর বরুণ বর্মণের মতো পেস বোলারদের বিরুদ্ধে খেলেন, ইডেনের পিচে তাদের মদনলাল-ওয়ালসনের সামনে গুটিয়ে যাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। পিচে প্রাণ ছিলনা, বোলিং-এও তেমন কামড় ছিলনা, তবু বাংলার সেরা ব্যাটধারীরা ইচ্ছা-মৃত্যুর পথই বেছে নিলেন। তবু এই ধ্বংস-স্তুপের মধ্যেও সংগ্রামের পতাকা একলা তুলে রাখলেন দলনায়ক রাজু মুখার্জী।

আর এই পতাকাই রাজুর হাতে ঝলমল করে উঠল দ্বিতীয় ইনিংসে। চতুর্থ দিনের প্রায় শেষ লগ্নে রাজুর হাত থেকে ঐ পতাকা নিয়ে তাতে যেন আগুন ধরিয়েছিলেন বরুণ বর্মণ !

বেশ কিছু দিন পর বরুণ একটি ভাল ম্যাচ খেললেন। পোড়েলও মন্দ বল করেননি। রাজু তো বটেই, দ্বিতীয় ইনিংসে উদয়ভানু ব্যানার্জী, প্রণব নন্দী এবং মাইকেল দালভিও মোটামুটি ভাল ব্যাট করেছেন। প্রবাল ঘোষও ব্যর্থ, তবে পলাশের ব্যর্থতা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সম্বরণ উইকেট কিপিংএ নৈপুণ্য বজায় রাখলেও, ব্যাটে ব্যর্থ। এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ অলোক ভট্টাচার্য।

বোলার দোসী অসফল, কিন্তু ব্যাটসম্যান দোসীর সংগ্রহ ১৯ ও ৪৪। দু' ইনিংসেই দোসীর ব্যাটিং আশা করি বাংলার ব্যাটস-ম্যানদের একটা জিনিস শিখিয়েছে : আন্তরিকতা এবং মনঃসংযোগ থাকলে দিল্লির মতো টীমকে অনায়াসে হারানো যায়।



দিল্লির সফলতম ব্যাটসম্যান অরুণলাল

নিয়মকানুন

(১) পত্রিকা প্রকাশিত হবে প্রতি মাসের ১ এবং ১৬ তারিখে।

(২) সংবাদ পাঠাতে হবে সরাসরি সম্পাদকের কাছে এই ঠিকানা—
৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

(৩) এক বছরের জন্য পত্রিকার গ্রাহক হতে হলে মানি অর্ডার করে পাঠাতে হবে ৩০ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হলে অতিরিক্ত ৩০ টাকা প্রদেয়।

(৪) আপাতত কলকাতা এবং শহরতলীর জন্য আমাদের মুখ্য পরিবেশক : শ্রীচন্দ্র পারিজা। বাইরের এজেন্টরা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

বিদেশের বিয়েতে তপু দাশগুপ্ত





অধীর প্রতীক্ষা তখন বিদেশ বসুর জন্য। যেহেতু উইকেট বিদেশ নয়, বর বিদেশের জন্য। গত ৮ মার্চ, শনিবার ফুটবল উইঙ্গার বিদেশ বসু বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হলেন দক্ষিণ কলকাতার পদ্মপুকুরের টুমকি সেনের সঙ্গে। বর আসার কথা কালনা হাড়িতে কেশবপুর থেকে। প্রায় আটটা বেজে গেল, তখনও বিদেশ আসেনি। চিন্তিত বাড়ির লোকেরা। চিন্তিত শৈলেন মান্না। শ্যাম থাপা বলেই ফেললেন, 'বিদেশ এটা ঠিক করেনি। গত কালই কলকাতায় এসে, নিজের বাড়ি থেকে বিয়ে করতে আসা উচিত ছিল।'

শ্যামের কথা শেষ হতে না হতেই বরের গাড়ি পৌঁছে গেল। বরবেশে বিদেশকে দেখাচ্ছিল ভাবুক এবং ক্লান্ত। কিন্তু মুখের হাসি অটুট ছিল।

বাড়ির লোকেদের ব্যস্ততাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল অটোগ্রাফ শিকারীদের তৎপরতা। সবার আগে এসে গেছেন শৈলেন মান্না, রামকৃষ্ণ চেতলাভী, এবং সুব্রত ভট্টাচার্য। যতীন চক্রবর্তী এলেন ভ্রুকুটিসহ। একে একে এলেন শ্যাম থাপা, প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন দত্ত, শিবাজী ব্যানার্জী, শিবব্রত নাথ, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জী, সমর ব্যানার্জী এবং মিসেস সুরজিৎ সেনগুপ্ত। খানিক পরে গৌতম সরকার, সুভাষ ভৌমিক এবং প্রদীপ চৌধুরী। হাসি ঠাট্টা গল্পে আসর জমজমাট। চেকি ছবি দিয়েছে খান জানে কিনা জানিনা, তবে অশোক দাশগুপ্তকে বিদেশের বিয়ের আসরেও খবর সংগ্রহে ব্যস্ত দেখা গেল। শ্যাম, সুব্রত, গৌতম—সবার মধ্যেই গভীর আলোচনা। বিষয় সম্ভবত দলবদল।

এই ব্যস্ততার মধ্যেই মঞ্চে নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান। অলসভাবে নীল হাওয়াই শার্টে সকলকে সচকিত করে ঢুকলেন পি কে ব্যানার্জী। গৌতম-সুব্রত-শিবাজী বিদেশদের সঙ্গে ছবি তুললেন, প্রায় পঞ্চাশজনকে অটোগ্রাফ দিলেন, বরবধূকে আশির্বাদ জানালেন—তারপর নাটকীয়ভাবেই বেরিয়ে গেলেন। অশোক দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'ইস্টবেঙ্গলে যাবার অ্যানাউন্সমেন্ট কবে?' হালকা হেসে পি কে জবাব দিলেন, 'সম্ভবত কাল।'

বিয়ের লগ্ন ছিল রাত দুটোয়। আসর তার আগেই ফাঁকা। বাড়ির লোকেরা অবশ্যই রইলেন। আর থাকলেন ফটোগ্রাফার শান্তি সেন।

কেশবপুরে বৌ-ভাত হল সোমবার, ১০ মার্চ। কলকাতা থেকে গিয়ে-ছিলেন শৈলেন মান্না, সুব্রত ভট্টাচার্য, রঞ্জিত মুখার্জী এবং গৌতম সরকার। এবারের লিগে বিদেশ বসুর ফুটবল দক্ষতায় অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান হবে। [illegible] সমর্থকরা উল্লসিত হবেন। বিদেশ আহত বা ব্যর্থ হলে সমর্থকরা বেদনা পাবেন। এই উল্লাস আর বেদনা এখন থেকে যাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করবে, তার নাম আমরা সকলেই জেনে গেছি—টুমকি সেন।



কনের সঙ্গে সুব্রত ভট্টাচার্য



বৌভাতে কেশবপুরে শৈলেন মান্না, যতীন চক্রবর্তী এবং গৌতম সরকার

আমরা ভাল খেলেছি

প্রসূন ব্যানার্জী



আরব এবং বাহরিন থেকে ঘুরে আসার পর আমি স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলাম যে, দিল্লি-অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। কারণ ওই সফরের শেষ ম্যাচে আমরা দুর্দান্ত ফুটবল খেলে প্রমাণ করেছিলাম যে, আমরাও খেলতে জানি। কিন্তু যখনই শুনলাম যে, সুরজিৎ, গৌতম, সুব্রত, এবং বিদেশের মতো প্রাক্তন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় দলের সঙ্গে যেতে পারবে না, তখন প্রচণ্ড দমে গেছিলাম। তবু আমি অধিনায়ক, তাই মনের জোর আনার চেষ্টা করেছিলাম, ভেবেছিলাম সেরাই থাক না সাধ্যমত লড়াই করে কী করা যায়। তবে এটা অস্বীকার করব না যে, বিশেষ আশা তখন আর ছিল না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আমার সহযোগী খেলোয়াড়রা যথাসাধ্য লড়াই করে আমি যে আশা করেছিলাম, তার চেয়ে বেশী পূরণ করে দিল।

১৯৭৫ সাল থেকে আমি ভারতীয় দলের সঙ্গে আছি। ভারতকে এর চেয়ে ভাল ফুটবল খেলতে একমাত্র আরব-বাহরিন সফরেই দেখেছি। বিদেশী কোচরাও একথা স্বীকার করেছেন। প্রাক্তন শীর্ষ খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে এবং ট্রায়াল ক্যাম্পের শত-প্রকার অসুবিধের মধ্যেও এরকম খেলা যায়, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রশ্ন উঠতে পারে ট্রায়াল ক্যাম্পে আবার কী অসুবিধে? তাহলে খুলেই বলি। আসল কথা, সিলেকশনটাই ভুল। দেড় মাস প্র্যাকটিস। তার মধ্যে আবার কুড়ি দিন ট্রায়াল যায়। এর পর টীম হয়। আবার যতে আগে দল গঠন করে, তারপর ট্রেনিং ক্যাম্প চলা উচিৎ। ট্রেনিং ক্যাম্প চলার সময়েই বা মালয়েশিয়াতেই একটি টুর্নামেন্টে ভারতের প্রথম সারির বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে আমাদের খেলতে হল কেন? এর ফলে সব খেলোয়াড়ই অনিশ্চয়তার আবর্তে পড়েছিল। শ্যামল ব্যানার্জী, যে সিঙ্গাপুরে আমাদের কোচ ছিল, তখনও কোচ বেল। সহ-অধিনায়ক সেবাস্টিয়ান এমন আঘাত পেল যে, চারটে খেলাতেই পারল না। শুধু কোচ-আঘাতই সমস্যা নয়। এতে টীম-স্পিরিট নষ্ট হয়, হয়েছেও। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার কথা আর তুললাম না।

ওখানে কারা কেমন খেলেছে? এ কথার উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় গোলকীপার ভাস্কর গাঙ্গুলীর। দুর্ধর্ষ গোলকীপিং করে ওখানে ও সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। ডিফেন্স-এ প্রায় সবাই প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে। তবু বলছি, বাবলুকে (সুব্রত) দরকার ছিল। ৪—৩—৩ প্রথার সাধারণত ভারতীয় দলে মাঝমাঠে থাকি, গৌতম এবং সেবাস্টিয়ান থাকি। সুতরাং সেবাস্টিয়ান-গৌতমকে বাদ দিয়ে হাফ-লাইন কেমন কার্যকরী হবে এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু পারমিন্দার এবং কুমারকে নিয়ে আক্রমণ জোরদার করতে না পারলেও আমাদের ডিফেন্সিভ ওয়ার্কে আমি সত্যিই খুশী। ফরোয়ার্ড লাইনে কিন্তু মানস বা শব্বর উইং-এ একদমই কিছু করতে পারেনি, যেটা সুরজিৎ থাকলে নিঃসন্দেহে সম্ভব হত।

আমরা যাদের বিরুদ্ধে খেলেছি, কোন সন্দেহ নেই ইরান তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার মনে হয়, ইরাণ এখন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ টীম। ওরা গাঙ্গুলি প্রভৃতি নিয়ে দিল্লি-অলিম্পিকে খেলতে এসেছিল। কাপও পেয়েছে। তবে আমাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বেশী গোল করতে পারেনি। যদিও আগের দিন তখনকার সংবাদপত্রে ওদের বিখ্যাত কোচ আবিদি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে ওরা অগণিত গোল করবে। সুতরাং এর থেকে প্রমাণ হয়, আমরা পারছি। একটা ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল খেয়ে চীনের কাছে হেরে গেছি। এই প্রসঙ্গে রেফারীং-এর কথা এসে আসছে। ভারতে রেফারীং-এর মান নাকি আরো বাজে। আমি কিন্তু জোর গলায় বলছি সিঙ্গাপুরের রেফারীং ভারতের চেয়ে খারাপ। রীতিমতো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

১৯৭৪ সালের এশিয়ান গেমসে আমরা চীনের কাছে ১—৭ গোলে হেরেছিলাম। অবশ্য আমি এবং সুরজিৎ তখন রিজার্ভে থাকার ছিলাম। বাবলুও তখন দলের সঙ্গে ছিলেন না। সুতরাং এবারের টীমে একমাত্র আমিই ছিলাম, যে ভারতকে চীনের কাছে গোলের মালা পরতে দেখেছে। তাই আর এক গোলে (অযৌক্তিক গোল) হারার আমার মনে হয়, পুরানো গ্লানির বেশ কিছুটা মুছে ফেলতে পেরেছি। আর এটাও বলছি যে, যদি সুরজিৎরা দলে থাকত এবং ট্রায়াল ক্যাম্পের অসুবিধেগুলোর সম্মুখীন হতে না হত তবে চীন, সিঙ্গাপুর এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে জিততেও পারতাম। তবে ইরাণকে হারানো হয়ত সম্ভব হত না। এই সত্যকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই। ওদের সঙ্গে আমাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তারতম্য নেই বললেই চলে। ওরা শুধু বিশেষভাবে প্রস্তুত হবার সুযোগটাকে গ্রহণ করে আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে।

আমার অধিনায়কত্ব সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, ভারতবর্ষের ফুটবলের মান যাই হোক, এই বিরাট দেশের নেতৃত্ব দেবার জন্য আমার গর্বের শেষ নেই। আরও গর্ব এই কারণে যে, আমার দাদা (প্রদীপ ব্যানার্জী) ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারতের ক্যাপ্টেন ছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা রেকর্ড যে, দুই ভাই কয়েক বছরের ব্যবধানে জাতীয় দলের নেতৃত্ব করেছে।

আমরা ওখানে 'ব্রাইন সিটি' হোটেলে উঠেছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, সুরজিৎ আমাদের হোটেলেই ৫২৪ নম্বর ঘরে এসে উঠল (আমার ঘরের নম্বর ছিল ৬০৭)। চমকে উঠেছিলাম। পরমুহূর্তেই জানলাম যে, কলকাতার দুটি পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে সুরজিৎ এসেছে দিল্লি-অলিম্পিকের উপর রিপোর্ট করার জন্য। একারণে আনন্দ হল, কারণ সুরজিতের কলমের মাধ্যমে তাহলে কলকাতার লোকেরা আমাদের খেলার খবর জানতে পারবে।

যাই হোক, ওর উপস্থিতি বাংলার খেলোয়াড়দের বিশেষ উৎসাহিত করেছিল।

ওখানে আমাদের খেলতে হত রাতে। মনোরম আবহাওয়ায় সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে প্রায় কার্পেট মোড়া মাঠে আমরা ফুটবল খেলেছি। এজন্য সংগঠকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমার সহ-খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে, যারা পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং ভারতের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরতে সারা জীবন দিয়ে দিতেও রাজী ছিল।

আমার লেখা শেষ করতে চাই ভারতের অফিসিয়ালদের কথা বলে। কোচ ম্যানেজার চেষ্টার অভাব ছিল না, কিন্তু কখনই দলকে উজ্জীবিত করার ভূমিকা নিতে পারেন নি। ব্যক্তিগতভাবে সবসময়েই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা অন্যদের তুলনায় খেলতেই জানি না। একজন কোচের উচিৎ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু তেমন কিছু আমাদের কাছে পাই নি।

পরের পাতায় দেখুন

জিকো

শান্ত মিত্র

ক্রিকেট যেমন ব্র্যাডম্যান বা সোবার্সকে আর কোনদিন পাবে না, হকি যেমন ধ্যানচাঁদ বা শমীউল্লাকে আর কখনো দেখবে না, টেনিস যেমন লেভার বা বর্গের মতন খেলোয়াড়কে সুদূর ভবিষ্যতেও পাবে কিনা সন্দেহ, ঠিক তেমনিভাবেই হয়তো আমরা আর কখনো পেলে বা ক্রুয়েফকে খুঁজে পাব না। তবুও কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে বিশেষ প্রতিভা খুঁজে পেলে তাকে কোন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চেষ্টা করি। খানিকটা আত্মতুষ্টি আমরা অবশ্যই পাই।

ফুটবল খেলার ধরণ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। ফুটবল এখন একটি বড় ব্যবসা। শিল্পকর্মের চেয়েও ফুটবলে তাই এখন পরিশ্রমের দাম। এই মুহূর্তে যদি অসাধারণ ব্যক্তিগত দক্ষতা নিয়ে কোন খেলোয়াড় হাজির হন, তাকে মাথায় তুলে নিতে দুনিয়ার ফুটবল রসিকেরা মোটেই দ্বিধা রাখেন না। এমনই এক ফুটবলার ব্রাজিলের Artur Antimes Coimbra—সারা পৃথিবী যাকে চেনে জিকো নামে।

ব্রাজিলবাসী তার নাম দিয়েছেন সাদা পেলে। কিন্তু এ কি শুধুই জাতীয়তাবোধের জন্য, যাতে সারা দুনিয়া বোঝে যে ব্রাজিলই পেরেছে আর একজন পেলের জন্ম দিতে? ব্রিটিশ সংবাদপত্র নিজের দেশের স্টারদের অনেক সময়েই অযথা ওপরে তোলে। জিকোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়।

১৯৭৬ সালে রিওতে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় জিকো প্রমাণ করলেন যে ব্যক্তিগত ক্রীড়াদক্ষতায় তিনি ব্রাজিলের বিখ্যাত পূর্বসূরীদের সমকক্ষ। তারপরই খ্যাতির উচ্চ-শিখরে ওঠার রাস্তা পাকা হয়ে গেল।

১৯৫৩ সালের ৩ মার্চ রিওডিজেনেরোর একপ্রান্তে অতি গরীব পরিবারে এক বোন ও চার ভাইয়ের পরে জিকোর জন্ম। পেট চালাতে জিকোকে রিওর সমুদ্রতটে ছুরী বিক্রি করতে হতো। সারাদিন কয়েকটি ছেলে ময়লা কাপড়ের বল নিয়ে রাস্তায় খেলত। পাড়া-পড়শীরা ওদের চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশে খবরও দিতেন। হায়, তখন ওরা ভাবতেই পারেননি যে, ঐ ঝাঁকের মধ্যের একটি রোগা ছেলের ছবি কয়েক বছর পরে তাদের ঘরে টাঙিয়ে রাখতে হবে—পেলে, গারিঞ্চা, রিভেলিনোর পরেই যে হবে ব্রাজিলের জনপ্রিয়তম ফুটবলার। একেবারে রাস্তা থেকে প্রাসাদে উঠে এসেছেন জিকো শুধুমাত্র ফুটবলের জোরে। তাই হয়তো একটু বেশীমাত্রায় সচেতন। জিকো বললেন, "ফুটবল একটা বিরাট খেলা। ছোটবেলা থেকেই আমি এর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে আমি বুঝেছি যে ফুটবল একটা ব্যবসাও বটে।...এখন আমি একজন নায়ক। কিন্তু দু বছরের মধ্যেই আমি 'ফালতু'তে পরিণত হতে পারি। একজন ফুটবলারের খ্যাতি অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। আগামী কালই একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আঘাত পেতে পারি, এমন কি ফর্ম হারাতেও পারি। আর তাই খেলোয়াড় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকেই আমি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিংড়ে নিতে চাই।"

হয়তো একটু বেশী মাত্রায় পেশাদারী মনোবৃত্তি। কিন্তু পরমুহূর্তেই জিকো বলছেন 'আমি লোভী নই, পাঠক-পাঠিকারা দয়া করে ভুল বুঝবেন না। তবে, ফুটবল হচ্ছে একটা বেয়াড়া খেলা—যা নিয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা চলে না।'

জিকোর সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল চোখ, চিতাবাঘের মতো দ্রুত গতি ও মনোরম ড্রিবল্ দেখে অনেকে আশা করেছিলেন, ফুটবলের রাজা না হোন, একদিন রাজপুত্র নিশ্চয়ই হবেন। পেলের মতোই দশ নম্বর জার্সি গায়ে চড়িয়ে অসাধারণ সব গোল করার ফলে ফুটবল অনুরাগীরা স্বভাবতই তার মধ্যে পেলের ছায়া দেখতে পেলেন। কিন্তু স্বয়ং জিকো বলছেন, 'আমি জানি কেন আমাকে পেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেহেতু আমিও দশ নম্বর জার্সি পরে খেলি। কিন্তু আমি রাজা নই। কিছুতেই না। রাজপুত্র? ইচ্ছে হলে ও রকম বলতে পারেন। তবে আসলে, আমি হচ্ছি আমি—জিকো।'

জিকোর খেলার বিশেষত্ব হল প্রখর বুদ্ধি ও বলের উপর সম্পূর্ণ দখল। অদ্ভুত গতিতে তিন চারজনকে অতিক্রম করে গোল করা তার কাছে অতি সহজ ব্যাপার। বছরে কুড়ি লক্ষ টাকা উপার্জনকারী জিকো ব্রাজিলের সবচেয়ে ধনী খেলোয়াড়। সংসারের টান আর দেশের মায়া জিকোকে প্রচণ্ডভাবে বেঁধে রেখেছে, সৌদি আরবের বিপুল অর্থ রবার্টো রিভেলিনোর মতো তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

অভাবের সংসারে অম্নাভাবের ফলে ছোট বেলায় জিকোর শরীর ছিল অপুষ্ট, দুর্বল। ফলে ফ্লেমিঙ্গ জুনিয়র দলের কোচ তাই তাকে প্রথমে দলে রাখলেন না। ডাক্তারের নির্দেশে এক বছর জিকোকে খাওয়ানো হল দামী ভিটামিন ট্যাবলেট এবং প্রচুর পরিমাণে মাংস ও অন্যান্য খাবার। ১৯৭০ সালে পেলে, গারসন, তোস্তাও জিনহো যখন মেক্সিকোতে ফুটবলের নতুন মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই ফ্লেমিঙ্গ যুবদলের হয়ে জিকোর আত্মপ্রকাশ। প্রথম বছরেই কুড়িটি খেলায় সাতাশটি গোল। ১৯৭৪ সালে ফ্লেমিঙ্গ সিনিয়র দলে এসে টীমকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করে। কিন্তু তবু এই নতুন খেলোয়াড়কে মিউনিক বিশ্বকাপ টীমে নিতে কোচ জাগালো রাজী হলেন না। ১৯৭৬ সালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেন জিকো। ব্রাজিল ২-১ গোলে জিতল। জয়সূচক গোলটি জিকোর। তারপর আর তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৭৮ সালে ফ্লেমিঙ্গের হয়ে মারকানা স্টেডিয়ামে একটি ডবল হ্যাটট্রিক করে একটি অসাধারণ রেকর্ডের অধিকারী হন।

কিন্তু ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপের প্রথম খেলার পরই কোচ কুটিনহো তাকে বসিয়ে দেন। অনেকে বলেন, এর কারণ আঘাত। সারা পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা এর ফলে নিরাশ হলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরে এলেন জিকো। সত্তরটি খেলায় করলেন তেষট্টি গোল। আবার পৃথিবীর সেরা দলগুলি জিকোকে পাবার জন্য পাগল হল। কিন্তু ব্রাজিলের মায়া তিনি কাটাতে পারলেন না। কোন কিছুর বিনিময়েই তিনি ব্রাজিলে পাওয়া সম্মানকে ছাড়তে রাজী নন। তবে এই নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় হয়তো একদিন ইতালিই জয়যুক্ত হবে। জিকোর নিজের ভাষায়, 'একদিন আমাকে ইউরোপে যাওয়ার কথা ভাবতেই হবে। টাকা পয়সার দিক দিয়ে একজন ফুটবলারের কাছে ইউরোপ স্বর্গ। ইতালি? সম্ভবত। আমার পিতামহ একজন ইতালিয়ান, তার মুখ থেকে ইতালির অনেক গল্পই শুনেছি। দেখা যাক কী হয়।'

আমরা ভালো খেলেছি

অশক কোচ জার্নাল সিং আরও এক কাঠি ওপরে। আমি অবাক হয়ে গেছি। জার্নাল না এত বড় প্লেয়ার ছিলেন। বাংলায় বহুদিন খেলেছেন। কিন্তু সবসময়েই খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে টীকা-টিপ্পনী কেটে খেলোয়াড়দের মনকে বিষিয়ে দিয়েছেন। এভাবে কেউ শ্রদ্ধা পেতে পারে না। আমার শুধু একটাই নিবেদন যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় দলের সঙ্গে যেন সেইসব লোকদেরই পাঠান হয় যারা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য এবং সবসময়েই খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে যারা ক্লান্তি বোধ করেননা।



জুবিলি টেস্টে

অম্বর রায়

প্রায় এক মাস পরে জুবিলী টেস্ট নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই স্পষ্ট মনে পড়ছে দুজনের মুখ—বয়কট আর বথাম। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটারদের সবচেয়ে প্রিয় ক্রিকেটার এই জিওফ বয়কট। স্টেডিয়ামে আমার পাশে অশোক মানকাদের বসার জায়গা ছিল। ওর হাতে প্রতিদিন থাকতো কাগজ ও কলম। দেখতাম, বয়কট যে ভাবে খেলছেন, ব্যাট চালাচ্ছেন, অশোক স্কেচ করে তুলে রাখছে কাগজে। আমার পাশে বসা আরো অনেক ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটাররা বয়কটের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রতিমুহূর্তে।

কিছুতেই আমি বোঝাতে পারবো না — বয়কট কেন এত বড় খেলোয়াড়। বোম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম যেন এতদিন এই খেলোয়াড়টির জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। সেই সঙ্গে আমরাও। আমার এবং আমাদের অনেকের প্রিয় বয়কটকে দেখার জন্যই জুবিলী টেস্টে গিয়েছিলাম।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, প্লেনে আসা-যাওয়া খরচ, সঙ্গে স্ত্রীকেও নিয়ে যেতে পারি এবং ওখানে থাকার জন্য ৩২০০ টাকা প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ করা হবে। এই ধরনের সুব্যবস্থায় সবাই খুশী। ক্যাপটেনদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অন্যান্য টেস্ট ক্রিকেটাররা অন্য সারিতে। জয়সীমা, সেলিম দুরানি, অশোক মানকাদ, আবিদ আলি—আমার পাশাপাশি বসেছিলেন। সবাই যেন অন্য এক মেজাজে। শুধু গল্প আর গল্প। অনেকদিন বাদে এক জায়গায় সবাই মিলিত হলে যেমন অতীতের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়, তেমনি সেখানেও নিজেদের মধ্যে নানা টেস্টের গল্প চলছিল। কে কবে কেমন করে আউট হয়েছিলেন, কে কাকে কীভাবে আউট করেছিলেন—সেই সব স্মৃতি। বেশ ভালো লাগছিল। আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। ভারতের মাটিতে ক্রিকেট নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান ও উৎসব এর আগে হয় নি। তাই সবার মনে আলাদা এক আনন্দ ছিল।

রেস্ট-ডে-র ডিনার পার্টিতে আটশোর মতো লোক উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই বয়কট, ব্রিয়ারলীর সঙ্গে দু-চার কথা হয়েছিল। এর আগে ব্রিয়ারলী যখন ভারতে টেস্ট খেলতে এসেছিলেন, আলাপ হয়েছিল। ব্রিয়ারলী সহজেই চিনতে পারলেন আমাকে। ওঁকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, অস্ট্রেলিয়ার কাছে তিনটি টেস্টে হার হল কেন। ওঁর ব্যবহারের যেন তুলনা হয় না, তেমনি বুদ্ধি। ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ডেনিস লিলি'।

ওয়াংখেড়েতে বথাম সেই ভূমিকা নিয়েছিলেন। বথাম কেন এত বড় বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিংয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যে উইকেটে আমাদের বোলাররা পাঁচটার বেশি বল লিফট করাতে পারেন নি, সেখানে বথাম একাই ২০টা বল লিফট করিয়েছে। সেই সঙ্গে মারাত্মক স্যুইং। দুটো বল যেন দু'রকমের। ঐ বলের সামনে কোনো ভালো খেলোয়াড়ও সহজে বেশী রান করতে পারেন না। তার উপর ভারতীয়রা এই টেস্টকে 'ফেস্টিভ্যাল ম্যাচ' হিসাবে নিয়েছিলেন। খেলাতে তেমন গা ছিল না। কিন্তু ইংল্যাণ্ড টীম টেস্ট টেম্পারামেন্ট নিয়েই জুবিলী টেস্টে এসেছিলেন। গাভাসকার (৪৯) যদি প্রথম ওভারে লিভারের বলে এল বি ডাব্লু হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেন তাহলে হয়ত ১০০ রানে ভারতীয় টীমের ইনিংস পতনকেও অস্বাভাবিক বলে মনে করতাম না। ঐ উইকেটে বথাম যে বল করেছেন এবং বলা যায় বথাম সেই টেস্টে যে ফর্মে ছিলেন, তাতে যে কোনো বাঘা খেলোয়াড়ও বথামের বলের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারতেন না। কি বিশ্বনাথকে ব্যাট হাতে সেদিন এত বেমানান লাগছিল — আমরা সবাই দুঃখ পেয়েছিলাম।

দ্বিতীয় ইনিংসে বথাম এত সুন্দর বল করেছিলেন,—একটি মাত্রও মিড অফ বা মিড অন দিয়ে কেউ পাঠাতে পারেনি। শুধু একটা বল হাফ ভলির ওপর ছিল বলে ঘাউড়ি কভারে পাঠাতে পেরেছিলেন। সবাই একবাক্যে বথামের বোলিং প্রশংসা করার পরও বথামের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার থেকে যায়। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মিডিয়াম পেস বো লার ইয়ান বথাম।

ক্যাপটেন হিসাবে ব্রিয়ারলীকে কোনো চিন্তা করতে হয় নি এই টেস্টে। বথাম ওঁকে নিশ্চিন্ত করেছেন। কিন্তু টিম স্পিরিট বজায় রেখেছেন ব্রিয়ারলী। সময় নষ্ট করতে দেন নি কোনো সময়। আর ভালো লেগেছিল, কী ভাবে ওঁরা বলকে নার্স করেন—তা দেখে। বোলারের কাছে বল যাওয়ার আগে চার-পাঁচজন বলটাকে একবার করে ঘষে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ফলে টী-এর পরেও বলে স্যুইং করিয়েছিলেন বথাম। ইংল্যাণ্ড টীমের বড় গুণ—খেলোয়াড়দের স্ট্যামিনা। ৩০ ওভার মাপা লেংথে বল করেছেন বথাম।

ভারতীয়দের অভাব সেইখানেই। বথামের পাশে কপিল, ঘাউড়ি, বিন্নিরা কেমন যেন নিষ্প্রাণ ছিলেন। দোশী মোটামুটি ভালো বল করেছেন। ইংল্যাণ্ড টীমের আর একজনের কথা বলা উচিত। সেই একজন—ডেভিড গাওয়ার। ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের এ্যাসেট। টেলরকে কখনোই কিরমানীর চেয়ে বড় মনে হয়নি আমার কাছে। ভারতের পরাজয় হয়ত দুঃখজনক, কিন্তু স্বাভাবিক। বিশ্বনাথের ক্যাপ্টেনশীপে নতুনত্ব ও পরিনতির ছাপ ছিল না। আমার অন্তত মনে হয়েছে, গাভাসকারের ক্যাপ্টেনশীপ অপরিহার্য ছিল বিশ্বনাথকে বাঁচানোর জন্য গাভাসকারের উচিত—ক্যাপটেন শীপের দায়িত্বটা সম্ভব হলে ফিরিয়ে নেওয়া এবং বোর্ডের উচিত ফিরিয়ে দেওয়া।



একটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্য

মনীশ মৌলিক

টেবিল টেনিসের একচল্লিশতম তৃতীয় আসর শুরু হওয়ার প্রায় মাসখানেক আগে বাংলার কিছু টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত যে বার্তা প্রচ্ছন্নভাবে প্রায় শাসানীর ভঙ্গীতে রেলওয়েতে চাকুরীরত খেলোয়াড়দের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল তা হল, আর এস সি বি (রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড) এর অনুমতি ছাড়া কোনও খেলোয়াড় রাজ্যের হয়ে খেলতে পারবে না। আর তারা যদি এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে রাজী না হয় তাহলে ঝুঁকি নেবার সম্পূর্ণ দায় তাদেরই এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত যে-কোন রকমের শৃংখলাভঙ্গের দায়ে কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেন। ন্যাশনালের প্রায় একমাস আগে পাওয়া এই 'মিষ্টি চিঠি' খেলোয়াড়দের বুকে বেঁধে শক্তিশেলের মত। আসলে ব্যবস্থার কঠোরতা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণভাবে অবহিত না হলেও বিধিভঙ্গের দায়ে সাংঘাতিক যে একটা কিছু ঘটতে পারে এটা ধারণা তারা করেই নিয়েছিল। দুটি ধারণা একত্রে প্রবল সম্ভাবনাময় ছিল। এক, চাকরী নিয়ে টানাটানি। অর্থাৎ রুটি-রুজির পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়া। দুই, কর্তৃপক্ষ তাদের এমন এক জায়গায় বদলী করে দেবেন যেখানে রেলকর্মীরা নিতান্ত ইচ্ছায় যেতে চান না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বদলীর স্থান এমনও হতে পারে যেখানে টেবিল টেনিস খেলা তো দূরের কথা, খেলার ইচ্ছে হওয়াটাই যথেষ্ট রকমের হাস্যকর। সজ্ঞানে কোনও খেলোয়াড়ই এ দুটো সম্ভাবনার কোনটার কবলে পড়তে ইচ্ছুক হতে চায় না, হয় না। অতএব এই বিজ্ঞপ্তির কুইনাইন গিলেও খেলোয়াড়েরা দেখল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নির্জীব ও বহুলাংশে শক্তিহীন বাংলা দল দুর্গাপুরে ন্যাশনাল খেলতে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চাপছে।

দিল্লীতে বসে তখন মনে মনে হয়ত হাসছিলেন আর এস সি বি'র সাধারণ সম্পাদক বাবু শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মতিলাল। কেননা এ কর্মকাণ্ডের মুখ্য নায়ক তিনিই। কেন এই কর্মকাণ্ড, এই প্রশ্নটা জাগা এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক।

ইতিহাসটা অনেকদিনের। রেলওয়েজের ন্যাশনালে যোগদান করার শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি রাজ্য এ ব্যাপারে তীব্র আপত্তি তুলেছিল।

ন্যাশনাল অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃরাজ্য ও ইন্স্টিটিউশন এবং অন্যান্য কিছু ইউনিটকে ঘিরে। কিন্তু দীর্ঘদিন রেলওয়েজ ও অন্যান্য কিছু ইন্সটিটিউশনও জড়িত ছিল এই জাতীয় আসরে। আপত্তিটা একটি কারণের ভিত্তিতে দানা বেঁধে উঠেছিল। খেলাটা যখন ইন্টার-স্টেট, তখন কোনও ইন্সটিটিউশনকে এখানে প্রশ্রয় দেবার অর্থ কি? বিশেষতঃ ইন্টার ইন্সটিটিউশনাল টুর্নামেন্ট যখন রয়েছে। জয়পুর ন্যাশনালে ব্যাপারটা তীব্র আকার নিয়েছিল। তখন বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর কলকাতায় শেষ হয়ে গিয়েছে। '৭৫এ বিশ্ব-আসরের ঠিক পরেই জয়পুরে ন্যাশনালের সময়ে একটি মাত্র ভোটের ব্যবধানে ন্যাশনালে রেলওয়েজের অপসারণ প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, যে একটি ভোটে রেলওয়েজকে বাতিল করা যায় নি, সেই ভোটটি রেলওয়েজের পক্ষে দিয়েছিলেন তৎকালীন টি টি এফ আইয়ের ট্রেজারার ফণী শর্ম্মা। দুর্লোকে বলে, ভোটটা সম্পূর্ণ পারচেজড ভোট। তাদের এই ধারণার কারণ, মিটিংয়ের আগে বেশ কিছু সময় ফণী শর্ম্মা ও রেলওয়েজের কর্মকর্তা সন্দেহজনকভাবে গুজগুজ-ফুসফুস করেছিলেন। প্রস্তাবটা মাত্র একটি ভোটের জন্য কেঁচে যাওয়ার জন্য অনেক রাজ্যই চটে উঠেছিল। তারপরে এলাহাবাদ ন্যাশনাল পেরিয়ে এসে বসন্ত বিদ্যানগরের জাতীয় আসরে যখন সবাই মিলে মোটামুটিভাবে স্থির করে নিয়েছিল যে, না, ইন্সটিটিউশনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তখন প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্বলিত কিছু ঝামেলা এবং অন্যান্য অনিবার্য কারণবশতঃ শেষ অবধি অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে এ ব্যাপারটা তোলা আর সম্ভব হয়নি। উদয়পুরে ব্যাপারটা চরম আকার নিল এবং সেখানেই জাতীয় আসর থেকে রেলওয়েজের অপসারণ ঘটল। দুর্দান্তভাবে চটে উঠলেন রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা। বিশেষতঃ-মতিলাল সাহেব। তিনি আর এস সিবি'র সাধারণ সম্পাদক। একচল্লিশটা জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েটেড সদস্য রেলওয়েজ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের আঁতে লাগল ঘা।

মতিলাল সাহেব একটু বেশী চটলেন বি টি টি-এর ওপর। কারণ ধুয়ো প্রথম তারাই তুলেছিল। তার সঙ্গে মহারাষ্ট্র, কেরালা, অন্ধ্র এদের ওপরেও রাগটা গেল আরও বেড়ে। কারণ বাংলার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এরাও তো হাত মিলিয়েছিল। টি টি এফ আইয়ের ওপরেও তিনি সন্তুষ্ট রইলেন না। কারণ রেলওয়েজকে শেষ পর্যন্ত অপসারণের সিদ্ধান্তটো তাদেরই নিতে হয়। অতএব সেই ভিত্তিতে তিনি টি টি এফ আইয়ের ওপরেও চটে উঠলেন। এরপরে শুরু হলো ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ।

বহিঃপ্রকাশ অর্থে তিনি স্পষ্টতঃ বাইরে লোকদের সামনে টি টি এফ আইয়ের সমালোচনা শুরু করে দিলেন। টি টি এফ আইয়ের এই সিদ্ধান্তকে অপরিণত বুদ্ধির ফল হিসেবে প্রকটিত করতে চাইলেন সবার কাছে। তার চেয়ে ফ্যান্টাসটিক যা করলেন, তা হল, বি টি টি এ'র যথেচ্ছ সমালোচনা। দু-একজন রিপোর্টারের কাছেও বি টি টি এর প্রসঙ্গে তার নিতান্ত আস্থাহীনতার কথা প্রকাশ করলেন। সন্দেহ প্রকাশ করলেন বি টি টি এ'র কর্মকর্তাদের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে। কিন্তু এখানেই শেষ হল না। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা ইত্যাদি অপবাদও দিলেন বি টি টি এ'র দুজন কর্মকর্তার নামে। কিন্তু এই দুজন কর্মকর্তারা গোটা ব্যাপারটাকে একান্তই ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করলেন। আসলে, এই অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটা তাঁদের মতে এতটাই ভিত্তিহীন যে এই ব্যাপারে তারা কোনও রকমের গুরুত্ব দিতেও অনিচ্ছুক। তাদের বক্তব্য, একমাত্র টেবিল টেনিসের একটি ক্ষীণ সুতো বাদ দিয়ে ফাল্গুনী মতিলালের সঙ্গে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অতএব ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার কথা উঠতেই পারে না। আর তাদের বক্তব্য, কুৎসা রটনায় যদি টেবিল টেনিসের উন্নতি হত তাহলেও নয় একটা কথা ছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন যেখানে অবান্তর, সেখানে কুৎসা রটানো মানেই তো নিজেদের গায়ে কাদা ছিটানো। সে কাজ করা আর যাই হোক অন্ততঃ বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এদিকে ফাল্গুনী মতিলালের পুঞ্জীভূত আক্রোশ বাস্তব রূপ নিল। বিজ্ঞপ্তি, যেটা খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে এল তাতে স্বাক্ষর ছিল ঊর্ধ্বতন অফিসার মিঃ দিলের। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধিত হলেও, বিজ্ঞপ্তিতে মতিলালবাবুর নাম না থাকায়, মতিলাল বাবু ভেবেছিলেন দোষারোপ তার ঘাড়ে হয়ত পড়বে না। কিন্তু তলে তলে ঘটনাটা কি সবাই বুঝতে পারছিল। অতএব মতিলালবাবু শেষ অবধি সমালোচনার বাইরে রইলেন না। খেলোয়াড়দের ওপরে কিন্তু 'ডোজ' কার্যকর হতে শুরু করে দিল। দীপক হালদার, টমাস লী ইত্যাদি মেনস টীমের খেলোয়াড়রা দারুণভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হতে শুরু করল। শ্যামলী, তুষারকণা ইত্যাদি মেয়েরাও তাই গেল। সন্দেহ নেই, এই সব মেয়েরা এবং ছেলেরা বাংলার টেবিল টেনিসের বর্তমানে অনেকখানি ভরসা। তারা না খেললে বাংলা যে অতি অবশ্যই কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে, নিঃসন্দেহে এটা দারুণ সত্য।

দুর্গাপুরে অংশতঃ তাই প্রমাণিতও হল। একা কুম্ভের নকল বুঁদিগড় উদ্ধার মত লড়াই চালিয়ে যেতে হল দেবযানীকে। বাংলাকে এই রকম যে দুয়েকজন কুম্ভের ওপর আস্থা রাখতে হবে, বি টি টি এ আগেই এ গন্ধ পেয়েছিলেন। রেল-ওয়েজের এই মনোভাবের খবর পেয়েই বি টি টি এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে রেলমন্ত্রীকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন এই কারণে যে, রেলমন্ত্রী জানুন এমন সিদ্ধান্তে টেবিল টেনিসের উন্নতি হয় না। বি টি টি-এর পক্ষে প্রবীর মিত্র ২৫শে জানুয়ারী টেলেক্স করলেন কেন্দ্রীয় রেল-মন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর কাছে। টেলেক্স যে ভাবে পাঠানো হয়েছিল, তাতে যে সময়ে রেল-মন্ত্রীর কাছে সেটা পৌঁছানো উচিত ছিল, তা পৌঁছলো না। তবু খবর গেল রেলমন্ত্রীর কাছে। রেলমন্ত্রী ফাইল চেয়ে পাঠালেন। অর্থাৎ ফাইল চেপে রাখা হয়েছিল। সমস্ত ব্যাপার জেনে ত্রিপাঠীজী এ প্রসঙ্গে রেলের স্পোর্টস বোর্ডের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন, সিদ্ধান্তটা যথেষ্ট যৌক্তিক হয়নি। দুর্গাপুরে সম্ভবতঃ এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ফাল্গুনী মতিলাল জেনারেল মিটিংয়ে বোর্ডের এই হঠ-কারী সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন। সিদ্ধান্তটা যে যথেষ্ট যৌক্তিক নয় এবং পরবর্তীকালে টেবিল টেনিসের উন্নতিকারী হবেনা বলে স্বীকার করলেন। ব্যাপারটা শেষ অবধি মিটল কিন্তু কিছু জল ঘোলা করে। কিন্তু রাজ্যের এই ন্যাশনালে দল দুর্বল হল। ঠিক টীমের ঠিক খেলা পাওয়া গেল না। এই জন্য দায়ী কে? অবশ্যই রেলওয়েজ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড এবং স্পষ্টতঃ মিঃ ফাল্গুনী মতিলাল।

অথচ রেলওয়েজের এই রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেও অনেকে জাতীয় আসরে খেলেছেন। ইন্দুপুরী, শ্রদ্ধা শর্মা খেলার অনুমতি পেয়েছিল। এখন প্রশ্ন, ইন্দুপুরী বা শৈলজা সালোখে, শ্রদ্ধা শর্মা কি করে অনুমতি পায়? বিলাস মেনন ইত্যাদি কিছু খেলোয়াড় যারা লাল চোখকে মানেনি, দুর্গাপুরে জাতীয় আসরে অংশ-গ্রহণ করার জন্য তারা শাস্তি পাচ্ছে কি? সম্ভবতঃ তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না। কারণ, বিলাস স্পষ্টতঃই বলেছে, রেলের চাকরী থাকুক বা না থাকুক তার কিছু যায় আসে না। এরকম ধারণা অনেকেরই। সুতরাং মাঝখান থেকে ভুগতে হল কিছু রাজ্যকে। অন্যতম বাংলা।

বিভিন্ন রাজ্যের এই যে ক্ষতি, এ প্রসঙ্গে আর এস সি বি'র পক্ষে খুব রেগে গিয়েও শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মতিলাল কোন সদুত্তর দিতে পারবেন কি? বোধ হয় না। কারণ, দুর্গাপুর ন্যাশনালের শেষে মতিলালবাবু জেনে গেছেন ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রোশে, তার যাই হোক, খেলাধুলোর উন্নতি করা যায় না।

উদ্ধৃতি

"আমার ধারণা, রমেশ, ওর বাবার (রমানাথ কৃষ্ণান) চেয়েও বড় খেলোয়াড় হবে।" বিখ্যাত টেনিস কোচ **হ্যারি হপম্যান**।

●

"বিশ্বনাথের সঙ্গে আরো কয়েকজন থাকলে, খেলাধুলোর জগৎ অনেক পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠত।" জুবিলি টেস্টে টেলরকে ফিরিয়ে-আনা প্রসঙ্গে ক্রিকেট ভাষাকার **অ্যালান টমসন**।

●

"যে গৌরবদীপ্ত মুষ্টিযোদ্ধারা আগের রাত্রেই এশীয় চ্যাম্পিয়নশীপের আসর থেকে ভারতকে অনেক পদক এনে দিয়েছে — সোমবার রাত্রেই তাদের দেখলাম বোম্বে সেন্ট্রাল স্টেশনের সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের ঠাণ্ডা মেঝেয় শায়িত অবস্থায়!" — স্পোর্টসউইক সাপ্তাহিকে **জাভেদ আখতার**।

●

"এখনকার ছেলেরা যে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা পুরোপুরি বুঝে নিচ্ছে তাতে আমি খুশি। কারণ আমরা ... ... ।" **শান্ত মিত্র**।

●

"ব্যাটের একেবারে মাঝখান দিয়ে একটি পরিষ্কার ওভার বাউণ্ডারি মারার পর সেই ব্যাটসম্যান নিজেকে ধিক্কার জানাচ্ছে ধৈর্যের অভাবের জন্য — ক্রিকেট মাঠে এমন ব্যাপার এই প্রথম দেখলাম বা শুনলাম।" — জুবিলি টেস্টে সুনীল গাভাসকারের প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং প্রসঙ্গে **মাইক ব্রিয়ার্লী**।

●

"আত্মরক্ষামূলক ফুটবল যিনি খেলাতে চান, তার স্থান আর যেখানেই হোক, ব্রাজিলে নেই।"

—কুটিনহোর সমালোচনায় **পেলে**।

●

"এক দশক বুদ্ধিটি পর সিদ্ধির শিচে কখনো পুল শট নিতে যেওনা। নিতে পারো, তবে সেক্ষেত্রে কয়েক পাটি অতিরিক্ত দাঁত হাতের কাছে মজুত রেখো।"

—**ডন ব্র্যাডম্যান**

●

"মহিলা ফ্যানেরা যখন দল বেঁধে আমার স্বামীর কাছে আসে, আমি কিছু মনে করিনা। তবে কেউ একা এলে খারাপ লাগে।" আসিফ ইকবালের স্ত্রী **ফারানা**।

সোবার্সের টেস্ট



ব্যাট-বলের এক অভিনব লড়াই দেখতে গেলে আমাদের ফিরে তাকাতেই হবে প্রায় আট বছর পেছনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি। সোবার্সের নেতৃত্বে বিশ্ব একাদশ অস্ট্রেলিয়া সফর করল। দলটি গঠিত হয়েছিল প্রধানত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্থান এবং ভারতীয় খেলোয়াড় সমন্বয়ে। ওদিকে ইয়ান চ্যাপেলের নেতৃত্বে তৈরী করা হল একটি শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দল। মেলবোর্নে এই খেলায় ব্যাট করতে নেমে বিশ্ব একাদশ অচিরেই এক দারুণ ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। ডেনিস লিলির দুর্দান্ত পেস বোলিংয়ের দাপটে ১৮৫ রানের মধ্যে বিশ্ব একাদশের এগারোটি প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটল। এরপর অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ২৮৫ রান করতে পেরেছিল মূলত গ্রেগচ্যাপেলের অপরাজিত সেঞ্চুরির জন্য। দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে ধাঁপিয়ে পড়ল বিশ্ব একাদশ। তিন উইকেটে ১৮৬ রানের মাথায় জাহির বিদায় নিলে ব্যাট হাতে মাঠে এলেন আত্মপ্রত্যয়ী সোবার্স। উইকেটে এসে লিলি ও ম্যাসীর মাপা লেংথের বলগুলোকে মারতে শুরু করলেন মাঠের চারদিকে। চওড়া ব্যাটের নির্মম প্রহারে বল-গুলো ছিটকে পড়তে লাগল সীমানার ওপার, কখনো উঁচু হয়ে, কখনো মাটিকে দলেন করে। সেদিন চল্লিশ হাজার দর্শক এই ব্যাটিং দক্ষতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল। অবশেষে ৩৭৬ মিনিটে ২৫৪ রানের সেই স্মরণীয় ইনিংসটির পরিসমাপ্তি ঘটল। মোট ৫১৪ রানের শক্ত ইমারতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন সোবার্স। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১৭ রান করেও অস্ট্রেলিয়া পরাজয় এড়াতে পারেনি। ক্রিকে-টের প্রবাদ পুরুষ ডন ব্র্যাডম্যান সোবার্সের এই ইনিংসটিকে অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর দেখা সেরা ইনিংসের আখ্যা দিলেন। ব্র্যাডম্যানের দেওয়া এই মহামূল্য উপহারটি সোবার্স আজও তাঁর মনের মধ্যে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন।

রতন ভট্টাচার্য

জাতীয় হকিতে

আসলাম ও অশোকের সঙ্গে

কটকে আমি অতিথি ছিলাম কলকাতারই এক সহযোগী কাগজের আত্মীয়ার বাড়ীতে। শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটাই হানা দেওয়া গেল এয়ারলাইন্সের আস্তানায়। আমরা দুজনে পরিচয় দিয়ে আসলাম শের খানের সঙ্গে আলাপ জমালাম। আলোচনা হয়েছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক, তবে এই অল্প পরিসরে শুধু উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করছি।

প্রথমত এই প্রতিযোগিতাই ছিল আসলামের শেষ প্রথম শ্রেণীর খেলা। তিনি অবসর নেবেন। এয়ারলাইন্সের চাকরী (ফ্লাইট পার্সার) ছাড়বেন এবং সক্রিয় রাজনীতি করবেন।

(দুই) ভারতে হকির এই শোচনীয় পরিণতির জন্য তিনি দুর্বল প্রশাসনকে দায়ী করেন।

(তিন) তাঁর মতে '৭৫ সালে বিশ্বজয়ই ভারতীয় হকির সর্বনাশের আর একটি কারণ। প্রচণ্ড আত্মতুষ্টি সমস্ত ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

(চার) আজকাল অ্যাস্ট্রো টার্ফ নিয়ে বিরাট হৈ চৈ হচ্ছে, আসলাম মনে করেন না এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ।

(পাঁচ) পাঞ্জাব ও ভূপাল এই দুই খানদানী হকি ঘরানায় হকির প্রদীপ জ্বালাবার লোক নেই। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন।

(ছয়) তবু তিনি আশাবাদী। তিনি মনে করেন সঠিক পরিকল্পনা হাতে নিলে নিশ্চয়ই আমরা এগোতে পারব।

কোনার্কে মুখে অশোককুমারের সঙ্গে দেখা। তিনি অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ। ঠিক হলো নাকি এমনিতেই আই এইচ এফ কর্তাদের যথেষ্ট অসন্তোষ। আর তিনি এই অসন্তোষ বাড়াতে চান না। বুঝলাম না এই গুরুত্ব খেলাতেও কেন অশোককুমার হকি কর্তাদের এত ভয় করছেন? সম্প্রতি কলকাতার দলীপ ট্রফি খেলার সময় বেদী ও চন্দ্রকে নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত করবার ব্যাপারে একটি প্রচার সত্র সক্রিয় ছিল। তাঁরা রাজী হন নি। কারণ বোর্ড সভাপতি চিন্নাস্বামীর অনুমতি নেওয়া যায় নি। এঁরা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় প্রতিভা, কিন্তু আজও কি টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখছেন? অশোকের ব্যাপারটিও খানিকটা ঐ রকম।

এ আই সি এস

সেমিফাইনালের দিন (সেকেণ্ড লেগ) মাঠে এসে দেখা হলো দেশ প্রখ্যাত সংবাদ-পাঠক ও ভাষ্যকার সুরজিত সেনের সঙ্গে। তিনি এখানে এসেছিলেন "অবজারভার" হিসাবে। বলা বাহুল্য তিনি এখন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের সদস্য (এ আই সি এস)। জানতে চাইলাম তারা রাজ্য সরকারের স্পোর্টস কাউন্সিলের মতন অর্থ সাহায্য দেন কিনা বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে। সুরজিত সেন জানালেন যে সম্প্রতি কটকে যে এশীয় বক্সিং হয়ে গেল সেখানে তিনি যা আর্থনৈতিক সঙ্কট দেখেছেন তাতে তিনি অর্থ স[illegible]ন ব্যাপারে আগ্রহী।

হকি প্রসঙ্গে এ[illegible], ভারতে ভাল গোলকীপার নেই, এমন কি চোখেও পড়ছে না। রক্ষণভাগেও তেমন ভাল খেলোয়াড় কই? পেনাল্টি কর্নার আক্রমণের দক্ষতা কোথায়? ফরোয়ার্ডও তেমন নেই, তবু মার্ভিন ফার্ণাণ্ডেজ শিবজির সহায়ে। ছেলেটির ভিতর খেলা আছে বলেই সুরজিত সেন মনে করেন। ঢালাও পরিবর্তন দরকার এবং এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা নেওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। তাঁর সুরও অনেকটা আসলামের সুরের সঙ্গে মিলে যায়।

হকি খেলা

আমার মোট চারটি ম্যাচ দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

(এক) সার্ভিসেস বনাম রেলওয়ে (দ্বিতীয় লেগ)

(দুই) ওড়িশা বনাম এয়ারলাইন্স (দ্বিতীয় লেগ)

(তিন) ওড়িশা বনাম সার্ভিসেস (তৃতীয় স্থান নির্ধারণকারী খেলা)

(চার) রেল বনাম এয়ারলাইন্স (ফাইনাল)

আমরা যাঁরা কলকাতায় বড়োবড়ো হকি টীম ও বেটনের খেলার ভিত্তিতে চোখকে তৈরি করে রেখেছি, তাদের কাছে ঐ খেলাগুলি নিঃসন্দেহে ভাল লাগবে। অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলাগুলি ভোগেনি। খেলা হয়েছে বেশ ভদ্র-ভাবে এবং অহেতুক ফাউল বা মারামারি জাতীয় পরিলক্ষিত হয়নি। কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামের মসৃণ ঘাস অনেকাংশে সাহায্য করেছে খেলাগুলিকে গতিময় করে তুলতে।

তবে ভারতের হকির দৈন্য ঢাকা পড়েনি আমাদের "[illegible]" বাঁধা চোখেও। যেমন ধরুন রেলের সেন্টার ফরোয়ার্ড রণধীরের কথা। তিনি কি আজকের খেলোয়াড়? ১৯৬৬ সালে ব্যাংককে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করেছিলেন। তাঁর মতন বর্ষীয়ান খেলোয়াড়কে রুখতে হিমশিম খেয়েছে যে কোন রক্ষণভাগ। এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন আন্তর্জাতিক খেলায় ভারত ন-সাত গোল অবলীলাক্রমে হজম করে যাচ্ছে।

গোলকীপার বলতে ভারতে এখন সত্যিই কিছু নেই। জানিনা কী হিসাবে এথান গোকিন্দ ভারতের জামা গায়ে চড়ান? ওড়িশার গোলরক্ষকও ছিলেন নড়বড়ে, তৃতীয় স্থান নির্ধারণকারী খেলায় ০—৫ ব্যবধান অনেকটা তাঁরই অসাবধানতার ফল। ব্যাক হিসাবে এখনও কিতো অনবদ্য। তাঁর অ্যান্টিসিপেশন, জায়গা নেওয়া, ট্যাকলিং এখনও চোখে পড়ে। তাঁর পক্ষে অন্যান্য ব্যাক যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন তাঁদের নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। রেলের প্রমোদ বাটলা, এয়ারলাইন্সের জিলিপ কুমার প্রভৃতি এই দলে পড়েন।

ফরোয়ার্ড লাইনে এয়ারলাইন্সের মারভিন ফার্ণাণ্ডেজ ছাড়া চোখে পড়েছেন জাফর ইকবাল (এয়ারলাইন্স), জাফিরুদ্দিন (রেল), এম পি সিং (রেল), যোহা (রেল), অমর সিং (ওড়িশা) প্রভৃতি। ছেলেদেরকে কেন বছর বছর ভারতীয় দলে খেলানো হচ্ছে তা বোধগম্য হলনা।

সব চাইতে দুর্বল বিভাগ হাফ লাইন। একজন ভাল হাফ ব্যাক চোখে পড়ল না। ওড়িশার সিং অগ্রগামী। তাঁর সে জৌলুস আর নেই। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট বয়সপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনিও প্রায় প্রবীণ। ওড়িশার দু'একজন ভাল। তবে বড্ড অপরিণত।

ফাইনাল নিয়ে দু'চার কথা বলবার আগে তারিফ করব পুরস্কারের সেমিফাইনালিস্ট ওড়িশার। প্রাক্তন অলিম্পিক খেলোয়াড় কিশোর নেতৃত্বে তরুণ খেলোয়াড়পূর্ণ দলটি সত্যিই নজর কাড়া হকি খেলেছে। শুনলাম শতকরা ৯০ ভাগ খেলোয়াড়ই ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার। উপযুক্ত তালিম পেলে এঁরা ভবিষ্যতে আরও ভাল খেলতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।

ফাইনাল খেলা তেমন উত্তেজক না হলেও, তিন-তিনটি 'ফিল্ড' গোল হয়েছে যা প্রশংসনীয়। তিনটিই ভাল, তবে অশোক কুমারের দেওয়া গোলটি ছিল সেরা। বিকল্প দিয়ে লাভ নেই। তবু সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঐ অসাধারণ গোলটি দিয়ে অশোক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি জাত খেলোয়াড়।

শিবাজী দাশগুপ্ত

সিঙ্গাপুরে প্রি-অলিম্পিক ফুটবলের আসরে পাঁচটির মধ্যে চারটি ম্যাচে হেরে হতমান ভারত ফিরে এল। অর্থাৎ, মস্কো অলিম্পিকের মূল আসরে যাবার ছাড়পত্র ভারতীয় ফুটবল দল পেল না। ১৯৬৪ সাল থেকে অলিম্পিক কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের খেলা চালু হয়। সেই থেকেই অলিম্পিকের মূল আসরে ভারত অনুপস্থিত।

১৯৪৮-এর লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় অধিনায়ক ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের হাফ-ব্যাক টি-আও। দ ছিলেন: ভরদ্বাজ, সঞ্জীব, শৈলেন মান্না, [illegible] মহম্মদ, পাপেন, বসির, মহাবীর প্রসাদ, অ[illegible] নন্দী, কাইজার, বজ্রভেলু, আমেদ খান, রমন, ধনরাজ, পরব, মেওয়ালাল, এস নন্দী এবং রবি দাস। প্রথম খেলাতেই ফ্রান্সের কাছে ২—১ গোলে হেরে ভারত বিদায় নেয়। ভারতীয় দল দুটি পেনাল্টি নষ্ট করে। ভারতের হয়ে গোল করেন রমন।

১৯৫২ সালে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের শৈলেন মান্না। টীমে আর ছিলেন: ভরদ্বাজ, বি-আন্টনি, ব্যোমকেশ বসু, আজিজ, সম্মুগম, লতিফ, চন্দন সিং, সুভাষ সর্বাধিকারী, এস রায়, নুর মহম্মদ, ভেঙ্কটেশ, রুনু গুহঠাকুরতা, সাত্তার, আমেদ খান, সালে, জে আন্টনি এবং মইন। কাগজে কলমে ভারতীয় দল শক্তিশালী হলেও, প্রথম ম্যাচে যুগোস্লাভিয়ার কাছে পরাজিত হয় ১০—১ গোলে। ভারতের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন ইনসাইড ফরোয়ার্ড আমেদ খান।

১৯৫৬ সালে ভারত মেলবোর্ন অলিম্পিকে যায় মোহনবাগান ক্লাবেরই সমর ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। পরপর তিনটি অলিম্পিকে জাতীয় দলের অধিনায়ক একই ক্লাব থেকে—সম্ভবত এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। টীমে আর ছিলেন: থঙ্গরাজ, নারায়ণ, রহমান, আজিজ, লতিফ, কেম্পিয়া, সালাম, নিখিল নন্দী, আমেদ হোসেন, নুর মহম্মদ, প্রদীপ ব্যানার্জী, কেষ্ট পাল, কিট্টু, কান্নাইয়ান, নেভিল ডি'সুজা, বলরাম এবং তুলক্কিকার। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারায় ৪—২ গোলে। হ্যাটট্রিক করেন সেন্টার ফরোয়ার্ড নেভিল ডি'সুজা। কিন্তু সেমি-ফাইনালে যুগোস্লাভিয়ার কাছে ভারতকে হারতে হয় ৪—১ গোলে। এইদিনও ভারতের পক্ষে গোল করেন নেভিল ডি'সুজা। শেষ খেলায় বুলগেরিয়ার কাছে ৩—০ গোলে হেরে ভারত চতুর্থ স্থান পায়। শুধু সেমি ফাইনালে ওঠার জন্যই নয়, মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতের খেলাও বেশ



চুণী গোস্বামী

উঁচুদরের হওয়ায় ফুটবল অনুরাগীরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল সমালোচক উইলি মিজেল লিখলেন, "এই টুর্ণামেন্টে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে ভারত। অলিম্পিকে ভারতের আসার ব্যাপারেই নাকি সন্দেহ ছিল। কিন্তু মেলবোর্ণে এসে প্রমাণ করেছে যে অল্পদিনের মধ্যেই এশিয়া তারপর পৃথিবীর ফুটবলে ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে।

যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে নেভিল ডি'সুজার দেওয়া গোলটি দর্শনীয়তার দিক দিয়ে এই টুর্ণামেন্টের সেরা গোল। যুগোস্লাভিয়ার সেন্টার হাফ পাপেককে চারবার উল্টো দিকে ঝুঁকিয়ে, ডি'সুজা চূড়ান্ত শটটি নেয়।"



১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারত যায় প্রদীপ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। অন্যরা ছিলেন: থঙ্গরাজ, নারায়ণ, চন্দ্রশেখর, লতিফ, অরুণ ঘোষ, ফ্র্যাঙ্কো, জার্ণেল সিং, কেম্পিয়া, রাম বাহাদুর, হাকিম, চুণী গোস্বামী, কানন, বলরাম সুন্দররাজ, দেবদাস, হামিদ এবং ইউসুফ খান।

প্রথম ম্যাচে ভারত হাঙ্গেরির কাছে হারে ২—১ গোলে। ভারতের পক্ষে গোলটি করেন বলরাম। দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রান্সের সঙ্গে খেলা ১—১ হয়। ভারতের হয়ে গোল করেন পি কে ব্যানার্জী। শেষ ম্যাচে পেরুর হাতে হার হয় ৩—১ গোলে। ভারতের পক্ষে গোলদাতা সাইমন সুন্দররাজ।

১৯৬৪ সালে কোয়ালিফাইং রাউণ্ড চালু হয়। ভারতের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী। টীমে আর ছিলেন: থঙ্গরাজ, পি বর্মণ, নারায়ণ, চন্দ্রশেখর, জার্ণেল সিং, অরুণ ঘোষ, মুস্তাক আমেদ, নঈম, রাম বাহাদুর, প্রশান্ত সিংহ, পি কে ব্যানার্জী, হামিদ, কাজল মুখার্জী, ফ্র্যাঙ্কো, কেম্পিয়া, সুকুমার সমাজপতি, আপ্পালারাজু, ইন্দার সিং, ইউসুফ খান এবং সায়মাদ খান। কলম্বোয় ভারত সিংহলকে (তখন শ্রীলঙ্কা) হারায় ৫—৩ গোলে। গোলদাতা আপ্পালারাজু (৩) ও ইউসুফ খান (২)। ব্যাঙ্গালোরে ফিরতি ম্যাচে ভারত জেতে ৭—০ গোলে। গোলদাতা আপ্পালারাজু (৩), সায়মাদ খান (২), ইন্দার সিং (১) ও সুকুমার সমাজপতি (১)। লেবাননের বিরুদ্ধে ওয়াক-ওভার পেয়ে ভারত ইরানের মুখোমুখি হয়। তেহরানে ভারত ইরানের হাতে ০—৩ গোলে হার মানে। কলকাতায় ফিরতি ম্যাচে ভারত হারে ১—৩ গোলে। গোল করেন চুণী গোস্বামী। ভারত টোকিও অলিম্পিকে যাওয়ার ছাড়পত্র পেল না।

১৯৬৮ সালে তেল-আবিবে প্রি-অলিম্পিকের খেলা নির্দিষ্ট ছিল। ভারত নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৭২ সালে প্রি-অলিম্পিকের আসর বসে বার্মায়। ভারতীয় দলে ছিলেন তরুণ বসু, ই সুধীর, বান্দিয়া, সুধীর কর্মকার, গুণাপাতিয়ান, ভরদেব সিং, শঙ্কর ব্যানার্জী, জর্জ অ্যাম্ব্রোজ, মোহন সিং, নটরাজ, সমরেশ চৌধুরী, হোসেন বোরা, উলগানাথন, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার, হাবিব, প্রদীপ বসু, জহর দাস, মগন সিং এবং মনজিত সিং। তিনটি ম্যাচেই ভারত পরাজিত হয়। বার্মা জেতে ৪—২ গোলে। ভারতের পক্ষে গোল করেন সমরেশ চৌধুরী এবং নটরাজ। ইন্দোনেশিয়া জেতে ৪—৩ গোলে। ভারতের পক্ষে দুটি গোল করেন সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার, একটি মগন সিং। ইস্রায়েলের কাছে হার হয় ০—১ গোলে।

১৯৭৬ সালে প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে ভারত যায়নি। নিচু মানের জন্য ভারত সরকার এব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল।

১৯৮০ সালে প্রি-অলিম্পিকের আসর বসল সিঙ্গাপুরে। ভারতের অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জী। টীমে ছিলেন: ভাস্কর গাঙ্গুলী, ব্রহ্মানন্দ, কম্পটন দত্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্যামল ব্যানার্জী, পারমার, সামাদ, শেখরণ, দেবরাজ, কুমার, শারমিন্দার সিং, মানস ভট্টাচার্য, জেভিয়ার পায়াস, সাবির আলি, বালচন্দ্রন এবং নরিন্দার গুরুং। ভারত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জেতে ৪—০ গোলে। অন্য চারটি ম্যাচে চীন, সিঙ্গাপুর, ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে হারে যথাক্রমে ০—১, ০—১, ০—২ এবং ১—২ গোলে। টুর্ণামেন্টে পায়াস তিনটি এবং সাবির দুটি গোল করেন।

এ লোকটা কোথায় ছিলো !

সুপ্রিয় সেন

কথাটা বলেছিলেন এক প্রখ্যাত খেলোয়াড় —তাঁকে নাকি বলেছিলেন প্রেমেন মিত্তির মশায়। কথাটা হোল, কেউ যখন উপরে উঠছে তখন অনেকেই এসে তার মইটা ধরে। কিন্তু যেই সে ডগায় উঠে যায়, তখন তারা-ই মই ধরে টানতে বসে। হায় হায়, লোকটা যে উঁচুতে উঠে গেল।

খুব দামী কথা। অস্বীকার করার উপায় নেই যে একটা মানুষ খ্যাতিমান হ'লে কেবলমাত্র সেই কারণেই তার কিছু শত্রু হয়। আমাদের কারো কারো স্বভাবটাই এমন যে অন্যের সুনাম, যশ হ'লে আমাদের মর্মপীড়া অসহনীয় হ'য়ে ওঠে।

ক্লাসে ইন্সপেক্টর এসেছেন। তিনি অনুসন্ধান করলেন, এই ক্লাসের সবচেয়ে আনপপুলার ছেলে কোনটি। শিক্ষক মশাই দেখিয়ে দিলেন, একেবারে পেছনের বেঞ্চে কোণায় একা বিষণ্ণ মুখে একটি ছেলে বসে আছে :

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসু হলেন—তার দোষটা কী? ছেলেটি কি মারামারি করে? সে কী খারাপ কথা বলে? পড়া পারেনা একদিনও?

উত্তর এলো—না না, ছেলেটি খুব ভদ্র, বিনয়ী এবং ক্লাশে ভালো ফল করে।

"তবে? সেকি চুরি টুরি করে? অন্যের পেন্সিল, বই এসব হাতিয়ে নেয়?"

"না না—ছি ছি, তার স্বভাব সম্পর্কে কিছু বলার নেই।"

"সে কি তাহলে কোন নোংরা অসুখে ভোগে? ছোঁয়াচে কোন রোগ?"

শিক্ষকমশাই তাকে আশ্বস্ত করলেন, দারুণ স্বাস্থ্য তার।

হতবুদ্ধি পরিদর্শক জানতে চাইলেন, তবে এই অপ্রিয়তার কারণ কী?

শিক্ষক মশাই একগাল হেসে বল্লেন, কারণ আর কিছুই নয়, গতবারের পপুলারিটি কন্‌টেস্টে ও অনেক ভোটে জিতেছিলো। তার পর থেকেই কেউ আর ওকে দেখতে পারেনা।

আমাদের দেশেতো — পপুলারিটির ফলে আনপপুলারিটি পেয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি কোন দিন সেই খেলোয়াড়টিকে নাও চিনে থাকি, পরিচয়টুকু সীমাবদ্ধ থেকে থাকে খেলার মাঠের সত্তর বা কখনো মিনিটের দর্শনে, তবু তার স্বভাব সম্পর্কে নির্ভুল বিচার করে ফেলতে আমার দ্বিধা হয়না। খেলার মাঠের ভেতরে টেনশানে ঠাসা একটা কৃত্রিম পরিবেশ যে কারো চরিত্র বিচারের কষ্টিপাথর হ'তে পারেনা, তা আমরা ভুলে যাই।

আসলে আমাদের মধ্যেকার হাঁদা মামা আর ফুটোদাদারা চিরকাল খ্যাতিমান মানুষদের খুঁত খুঁজে বেড়ান। পেলে খুশী হ'ন, না পেলে নিজেরাই বানিয়ে নেন।

১৯৬৬ সালের এক রৌদ্রস্নাত জুলাইয়ের অপরাহ্নে ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে এক ইতিহাস রচিত হয়েছিলো। ইংল্যাণ্ড সেই একবার ফাইনালে ৪—২ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতলো। ইতিহাসে আরো একটি নতুন নাম সোনার অক্ষরে লেখা হোল —আরো একটি নতুন রেকর্ড। ইংল্যাণ্ডের জিওফ হার্স্ট ফাইন্যালে একাই তিনটি গোল করলেন। তখন তো বটেই, আজো পর্যন্ত ফাইন্যালে এইটেই রেকর্ড।

কিন্তু ইংলণ্ডে কি আর হাঁদামামারা নেই? তারা চিরকাল বলে এসেছেন, জিওফ হার্স্ট একটা খেলোয়াড়ই নয়।

তার কোন স্কিল নেই, সৃজনী প্রতিভা নেই, বল কন্ট্রোল নেই—নেই নেই কিছুই নেই। সে কেবল পাগলের মতো সারা মাঠে দৌড়োদৌড়ি করে। সেই দৌড় নেহাতই এলোপাথাড়ি উদ্দেশ্যহীন ছুটোছুটি। আসলে কী করতে হবে তা জানেনা বলেই হতবুদ্ধির মত ও দৌড়োয়। তথাকথিত বোদ্ধা সমালোচকরা সব কালে সব দেশেই চেঁচিয়ে বাজীমাৎ করার চেষ্টা করেন। হার্স্টকে ইংলণ্ড দলে নির্বাচিত করাটাকেই তারা প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন।

সেই জিওফ হার্স্ট কিনা শুধু দলে আসাই নয় ফাইনাল খেললো এবং গোল করলো। তাও আবার কোনক্রমে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যাওয়া একটা ফ্লুক গোল নয়। তিন তিনটে। অনেকেই লিখে ফেল্লেন, আসলে নিতান্তই ঘটনাচক্রে হার্স্ট তিনবারই ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে থেকে গিয়েছিলো, তাই তিনটে গোল হয়েছে। একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক লিখলেন, "জিওফ হার্স্ট প্রমাণ করলো যে ফুটবলে এখন অতিসাধারণ খেলোয়াড়দেরই জয় জয়কার, যদি তিনটে গোল করার মত অসাধারণ ঘটনা তারা ঘটিয়ে ফেলতে পারে দৈবক্রমে।" অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফাইনালের মত খেলায় তার দেওয়া তিনটি গোলই হঠাৎ ঘটে যাওয়া দৈবমাত্র। নেহাৎই ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন পরিহাস।

হাঁদামামা ছাড়া এ ধরণের বোদ্ধাদের কী বলা যায় বলুন?

আসলে অত্যন্ত পরিশীলিত চোখ এবং ফুটবল প্রজ্ঞা না থাকলে জিওফ হার্স্টের ভূমিকাটি হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ দর্শকের সাধ্য ছিলোনা। যারা ফুটবলের সত্যিকার জহুরী তাঁরা কিন্তু হার্স্টের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন কিছু দুর্লভ ক্ষমতা যার ব্যাখ্যায় একটু পরেই আসছি। কিন্তু সত্যি যদি বিশ্বকাপের গোল তিনটি একেবারে কাকতালীয়ই হয়ে থাকে তাহলে নীচের প্রশ্নগুলোর জবাব কে দেবে?

বিশ্বকাপের ফাইনাল টিমে হার্স্ট জায়গা পেল কী করে? মনে রাখতে হবে ইংলণ্ডের কোচ ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল সেনাপতি আলফ র‍্যামজে।

ওয়েস্ট হ্যাম, ববিমুরের দলে নিয়মিত প্রথম একাদশের একজন হার্স্ট কী করে হতেন যেই টিমের কোচ ছিলেন আর একজন বাঘ, রন গ্রীনউড?

১৯৬৮ সালে, অর্থাৎ ওই বিশ্বকাপ ফাইনালের দু'বছর পরে কী করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড হার্স্টকে কিনে নেবার জন্যে ওয়েস্ট হ্যামকে তৎকালীন হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা দর দিয়েছিলো? এর চেয়ে অর্ধেক দরে তখন ইংলণ্ডের অন্য যে কোন খেলোয়াড়কে পাওয়া যেত।

এবং কী করেই বা তাহলে সেই টেলিগ্রামের উত্তরে ওয়েস্ট হ্যাম পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম টেলিগ্রামে এদের উত্তর জানিয়ে দিয়েছিলো? উত্তরে ছিলো একটিমাত্র শব্দ, No।

ঐ ঘটনার কয়েক বছর পরে টটেনহ্যাম হটস্পারের ম্যানেজার বিল নিকলসন প্রায় পঁচিশ লাখ টাকায় মার্টিন পিটার্সকে নিজের দলে এনে তুলিতুলি দুটি টিকেট কেটে ওয়েম্বলীর গ্যালারীতে নিয়ে বসলেন। তারপর পিটার্সের কানে কানে বল্লেন, "ভালো করে হার্স্টের খেলা দেখো, তোমাকে ওর মত খেলতে হবে।" এইটে বা কী করে ঘটে?

আসলে হাঁদামামা আর ফুটোদাদারা হার্স্টের খেলার নিগূঢ়তত্ত্বই বোঝেননি। বুঝতেও চাননি। কেননা, আগেই বলেছি

আমরা অনেকেই মনে করি যে প্রসিদ্ধ লোকেরা কাঁচি দিয়ে খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়েছেন। আসলে ব্যাপারে সে রূপ নেই। এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত না হলে দৃষ্টিতে স্বচ্ছতা আসতে পারেনা।

আসলে হার্স্ট কীরকম খেলোয়াড় ছিলো?

শারীরিক দক্ষতা তার ভালোই ছিলো। দু পায়েই জোর শট ছিলো, বাঁ পা ডান পায়ের চেয়ে একটু বেশী চলতো। সময় এবং নিশানার জ্ঞানটি সঠিক থাকায় দুরন্ত হেড ছিলো তার। শক্ত শরীর, লম্বা, থাইমাসল খুব সুগঠিত থাকায় বিপক্ষের ট্যাকল সামলানো সহজ ছিলো, শরীরের ব্যালান্সও ভালো থাকতো। বল কন্ট্রোল ছিলো মোটামুটি—কিন্তু বলতে যা বোঝায় তা সত্যি তেমন কিছু ছিলোনা তার। সব মিলিয়ে আর দশটা গড়পড়তা প্রফেশনাল খেলোয়াড়ের যা যা গুণ থাকে, তাই ছিলো হার্স্টের।

তাহলে বাড়তি কী ছিলো? বাড়তি যেটা ছিলো সেটা হচ্ছে এই গুণগুলিকেই সুচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করবার নিপুণ ক্ষমতা।

একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

অনেক সময়ই দেখা যায়, অদক্ষ, কল্পনা-শক্তিবিহীন কোচের হাতে পড়ে অনেক খেলোয়াড়েরই স্বাভাবিক নিপুণতা প্রকাশ পায়না। মনে হয় তারা কোন কাজের নয়। শুধু যে দর্শকরাই তাকে বাজে খাতায় জমা করে তা নয়, খেলোয়াড় নিজেও ভাবতে সুরু করে যে তার কিছু হবেনা। প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ইরানের জানজারি। গত বছরেও গোড়াতেই দিল্লী বলেছিলেন, একটি দারুণ খেলোয়াড়ের কথা, যে কলকাতাকে চমকে দেবে। আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু জানজারির খেলা সবাইকেই হতাশ করলো। শেষটাতো খুব বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই তাকে ভারত ছেড়ে যেতে হোল।

কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনেকেই বলেন, সেই জানজারি কী দুর্ধর্ষ খেলেছে ইরানের হয়ে। এশিয়ার সেরাদল ইরানের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জানজারি, যাকে আমরা অনায়াসে বাজে খেলোয়াড় বলে দাগ করে দিয়েছিলাম। কারণ খুব সহজ। ইরানে ফিরে গিয়ে সে নিশ্চয়ই এমন একজনকে কোচ হিসেবে পেয়েছে, যিনি তার মূল্য উপলব্ধি করেছেন। তাকে দিয়েছেন স্ট্রাইকার ব্যাক বা লিবারোর ভূমিকা। যে ভূমিকায় পূর্ণ বিকশিত হয়েছে তার ক্ষমতা।

অর্থাৎ যার জন্যে যে কাজ, সেটা কোচকে বুঝতে হবে।

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জিওফ হার্স্ট তার দলের একজন অতি সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত ছিলো। এমনকি তার নিজের কাছেও। কেননা গত দু বছরে মাত্র আটটি খেলায় সে প্রথম দলে জায়গা পেয়েছিলো। তখন সে উইং হাফ হিসেবে খেলতো। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সারা খেলায় —কিন্তু, ব্যস, ওই পর্যন্ত।

হার্স্ট তার নিজের খেলায় উন্নতির কোন চিহ্ন না দেখে নিজেই তখন হতাশ। ভাবছে ক্লাব ছাড়বে কিনা।

এমন সময় ওয়েস্ট হ্যামের ভার নিলেন রন গ্রীনউড। তিনি এসেই হার্স্টের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণ দেখতে পেলেন। এক, তার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং দুই—শেখবার জন্যে অসীম আগ্রহ। গ্রীনউড তখন মনে মনে তৈরী হয়েছেন খেলার স্ট্র্যাটেজিতে একটা একেবারে নতুন ধরণের পরীক্ষা করবার জন্যে। গোড়াতেই সেই পরিকল্পনায় প্রধান রূপকার হিসেবে তিনি হার্স্টকে বেছে নিলেন।

তখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে সেন্টার ফরোয়ার্ডদের একটাই গতি ভূমিকা ছিলো। সবচেয়ে বড়ো চেহারা হতে হবে তার। মধ্যমাঠ থেকে বিপক্ষের সেন্টার হাফের সঙ্গে লড়াই করে করে তাকে গোলমুখে যেতে হবে। এবং সেখানে গিয়ে সতীর্থদের পাসের জন্যে তাকে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

গ্রীনউড সেন্টার ফরোয়ার্ডের সংজ্ঞা পাল্টে দিলেন। অনেক বেশী দাবী করলেন তিনি তার কাছ থেকে।

তিনি চাইলেন এমন একজন ফরোয়ার্ড যার মাথা হবে সাফ, যে খেলাটিকে পুরো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। সে হবে ডিফেন্সের পাস তুলে নেবার একটি চলমান 'ওয়াল' যে কখন কোথায় থাকবে তা কেউ আঁচ করতে পারবেনা। বিপক্ষের সীমানায় আক্রমণ সুরু করবে সে। কিন্তু তারপরেই সে হয়ে যাবে অদৃশ্য। তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা কোথাও। হঠাৎ শেষমুহূর্তে তাকে উদয় হতে হবে গোলের সামনে এবং চূড়ান্ত শটটি নিতে হবে গোলে।

সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগলো। হার্স্ট ব্যাপারটি ভালো ভাবে বুঝে নিয়ে নিজেকে তৈরী করবার জন্যে অক্লান্ত ভাবে খাটতে লাগলো। সেই প্রথম এ ধরণের পরিকল্পনার আদি রূপকার। তার সামনে কোন উদাহরণ নেই। তাকেই হতে হবে প্রথম দৃষ্টান্ত। একেবারে গোড়া থেকে সুরু করলো সে।

যখনি ওয়েস্ট হ্যাম দল আক্রমণের মুখে, হার্স্ট তখন মাঝমাঠে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে। কখনো ডানদিকে ছুটছে, তারপরেই থেমে গিয়ে যাচ্ছে বাঁ দিকে কোনাকুনি, আবার থমকে থেমে চলে যাচ্ছে মাঝমাঠে—সেখান থেকে বাঁক নিয়ে অন্য কোনদিকে। দেখলেই মনে হবে লোকটা পাগল। অথবা এত ঘাবড়ে গেছে যে কোথায় তাকে দাঁড়াতে হবে সেটা বুঝতেই পারছেনা।

আসলে কিন্তু হার্স্ট একেবারে সঠিক ভাবে তার কাজটি করে যাচ্ছে তখন। ও নির্ভুল ভাবে নিজেকে এমন ভাবে রেখেছে যাতে তার সতীর্থ ডিফেণ্ডাররা মুখ তুললেই তাকে দেখতে পায়। বিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নিতে পারলেই প্রথম পাসটি আসবে মধ্যমাঠে তার কাছে।

পাসটি এলে এবারে তার দ্বিতীয় কাজ। বহুদিনের সাধনায় প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলো হার্স্ট তার ক্ষমতাকে। হেড দিয়ে হোক, পা দিয়ে হোক অথবা বুক দিয়ে ধাক্কা মেরে হোক বলটি তাকে ঠেলে দিতে হবে কোন একটা ফাঁকা জায়গায় যেখানে তার সতীর্থ মধ্যমাঠের খেলোয়াড়রা আক্রমণের জন্যে এগিয়ে আসছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পাসটা কোন বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণেই বোঝা যাবে যে বলটা যে ফাঁকা জমিতে গিয়ে পড়লো সেটা তার দলেরই কারো দখলে।

বলটি পাস করেই হার্স্টের তৃতীয় কাজ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

শুনলে মনে হয় এই কাজটা খুব কঠিন। আসলে কিন্তু তা নয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়দের দৃষ্টি তখন দ্রুতগতিতে উপরে উঠে আসা ওয়েস্ট হ্যামের অন্য খেলোয়াড়দের দিকে। যেখানে বল সেদিকে। হার্স্ট তখন, যেন তার কাজ শেষ এরকম একটা ভঙ্গীতে মাঠের যেদিকটায় বল আসবার কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে চলে যাচ্ছে। স্বভাবতঃই তাকে নিয়ে তখন আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছেনা।

কিন্তু যখন মাথা ঘামাতে হোল, ততক্ষণে বিরাট দেরী হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল শেষমুহূর্তে গোল পোস্ট আর কর্নার ফ্ল্যাগের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে হয় হেড করে, নয় পা দিয়ে হার্স্ট গোলে বল ঠেলে দিয়েছে।

বিস্মিত হতবুদ্ধি ডিফেণ্ডাররা তখন পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে, 'এ ব্যাটাছেলে এলো কোত্থেকে?' 'ওকে আটকালনি কেন?' 'তুই কী করছিলি?' 'দেখতে পাসনি ওকে?' 'কখন?' 'কোথায়?' 'কী করে?'

সত্যিই। কখন? কোথায়? কী করে? এইটেই ছিলো গ্রীণউডের পরিকল্পনার মূল কথা। এর আগে যারা অনেক গোল করেছেন, তাদের কারো ছিল দুরন্ত শট, কারো ছিলো প্রচণ্ড হেড। কেউ বা চমকপ্রদ ড্রিবলের সাহায্যে বল একের পর এক কাটিয়ে নিয়ে গোল করেছেন। হার্স্ট ছিলো আলাদা।

এক কথায় বলতে গেলে সে ছিলো, "সেই লোকটি যে কোথাও ছিলোনা।"

সাংবাদিকদের কাছে পরবর্তীকালে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হার্স্ট বলেছে, 'যে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে তো পাহারা দেওয়া যায় না। যে নেই তাকে আপনি আটকাবেন কী করে? শট না হলে সেটাই বা বাঁচাবার প্রশ্ন কোথায়? যার কাছে বল নেই তাকে ট্যাকল করবে কে? আমার কাজ ছিলো দূরে থাকা, আড়ালে থাকা, লুকিয়ে থাকা যতক্ষণ না বল গোলকীপারের হাতের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন দৌড়ে যাও, হেড করো কিম্বা পায়ের তলা দিয়ে ঢোকা যায়। বল গোলে পাঠিয়ে দাও।'

এর আগে পর্যন্ত সাধারণতঃ সেন্টার ফরোয়ার্ডরা দ্বিতীয় পোস্টের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেন্টার বা পাসের জন্যে অপেক্ষা করতো। স্বাভাবিক, কেননা তাহলে গোটা গোলটা সামনে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীনউড বল্লেন, সেন্টার খারাপ হয়ে যখন প্রথম পোস্টের দিকে আসছে, তখন গোলকীপার এবং অন্যান্য ডিফেণ্ডাররা হাঁ হয়ে যাচ্ছে। কেননা গোল করার সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে। সেইটাই অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ।

এই থিয়োরীকে নির্ভুল প্রতিপন্ন করে হার্স্ট ১৯৬৩ থেকে '৬৬ পর্যন্ত অসংখ্য গোল করেছে। এমনকি রণ গ্রীনউড, স্বভাবত যিনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং মিতবাক, তিনি পর্যন্ত একদিন গর্ব করে বলে ফেলেছিলেন যে তিনটে সীজন ধরে হার্স্ট প্রতি সপ্তাহে এই এক পদ্ধতিতে গোল করে যাচ্ছে। কিন্তু বিপক্ষ দলগুলি এখনো ভাবছে যে এগুলো আকস্মিক ঘটনা। কী মূর্খ।

১৯৬৬-র বিশ্বকাপের চতুর্থ খেলায় প্রথম খেলতে নেমে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হুবহু এরকম একটি গোল করেছিলো হার্স্ট। সেই কাছের পোস্টে গোল। পাসটি দিয়েছিলো ওর একই টীমের খেলোয়াড় মার্টিন পিটার্স।

চতুর্থ খেলাতেও হার্স্ট সুযোগ পেয়েছিলো তার ভাগ্য এবং জিমি গ্রীভসের দুর্ভাগ্যের ফলে। গ্রীভসের পায়ে একটি বীভৎস ক্ষত হওয়ায় হার্স্টকে খেলাবার সিদ্ধান্ত নেন র‍্যামজে।

ফাইনাল খেলার দিন কিন্তু জিমি গ্রীভস সুস্থ হয়ে উঠলেও, স্যর র‍্যামজে তাকে খেলাননি। খেলিয়েছেন হার্স্টকেই। অথচ সেদিন যদি ভোট নেওয়া হোত তবে ইংলণ্ডের তৎকালীন পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ লোক দাবী করতো যে গ্রীভসকেই খেলানো হোক। পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র সেই সোচ্চার দাবীকে উপেক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন র‍্যামজে। এবং সে সিদ্ধান্ত যে কত সঠিক, ফুটবলের ইতি-হাসের শিলালিপিতে তা চিরকালের মত খোদাই হয়ে আছে।

হার্স্টের চরিত্রের অন্যান্য অনেক সুন্দর দিক ছিল। প্রসিদ্ধ হবার পর বিপক্ষের ডিফেণ্ডারদের প্রচণ্ড মার খেয়েও কোনদিন সে মাথা গরম করেনি। আরো কিছু ভালো দিক নিয়েও লেখা যেত।

কিন্তু অন্য একটা দিকে ইংগিত দিতে বাসনা হচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত দলের হয়ে অনেক গোল করলেও তার নিজের দলের সমর্থকরা কিন্তু তাকে পছন্দ করতো না। ওয়েস্ট হ্যামের সাফল্যের জন্যে তারা সাধুবাদ দিতো অসাধারণ ফিট যার আয়ত্বে ছিলো, সেই জনি বার্ণকে। হার্স্টকে সমর্থকেরা 'গাড়ীর ঘোড়া' বলে ব্যঙ্গ করতো। তারা বলতো, এটা খেলোয়াড়ের জাতই নয়।

ক্রমান্বয়ে তিন বছর ধরে তারা চীৎকার করে হার্স্টকে জ্বালাতো।

কিন্তু সেই ফাইনালের দিন সন্ধে থেকে মোড় ঘুরে গেল। তারা, শুধু তারাই নয়, ইংলণ্ডের আপামর জনসাধারণ জানতে পারলো যে তারা ভুল করেছিলো। বাস্তবিক পক্ষে ফুটবল খেলা তারা যতটা বোঝে বলে ভাবে ততটা বোঝেনা।

অবশ্যি চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। হাঁদা মামারা কেউ কেউ তবু চীৎকার করলো — তবে সে চীৎকারে আগের মত বিষ আর ছিলোনা।

আপনারা তো আর তেমন নন যে ভুল করলেও তা আঁকড়ে ধরে থাকবেন।

কাজেই ভবিষ্যতে একবাক্যে কাউকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করবার আগে একটু থমকাবেন। একটু ভাববেন যে আপনার বিচারটাই সঠিক কিনা।

("সকার—দ্য ওয়ার্লড গেম" অবলম্বনে)



জিওফ হার্স্ট





যদি কিছু করতে হয়

প্রদীপ ব্যানার্জী

একবছর আগেই লিখেছিলাম, 'দিল্লিতে আয়োজিত ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে ভাল ফল করতে হলে অবিলম্বে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। দীর্ঘদিন ভারতীয় ফুটবল দল থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। গত' আট বছরে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের অনেক গৌরবের অংশীদার হয়েও বারবার মনে হয়েছে, বড় কিছুই করা হল না। ভারতীয় ফুটবলকে কিছু দেওয়ার ছিল, ভারতীয় ফুটবলের জন্য কিছু করার ছিল, কিন্তু কিছু করার সুযোগ কর্ণধাররা দিলেন না। ভাবতে অবাক লাগে, এখনও পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ হওয়াও আমার ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি।

তবু আমাকে প্রশ্ন করা হয়, ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য কী করা উচিৎ? ১৯৮২ সালে এশিয়ান গেমসের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিৎ?

প্রথমত, এশিয়ান গেমসের মতো বড় টুর্নামেন্টের জন্য অল্প কয়েকদিনের ট্রেনিং ক্যাম্প যথেষ্ট নয়। আগামী দু'বছরে অন্তত ছ'টি ট্রেনিং ক্যাম্প করা দরকার, প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে দু'মাস। এই ক্যাম্পগুলোর ফাঁকে ফাঁকে খেলোয়াড়রা নিজেদের ক্লাব টীমের হয়ে লীগ খেলে নিতে পারে। আমি কোচ হলে, প্রথম থেকেই জগমোহন সিং বা ট্যাণ্ডনের মধ্যে যে কোনো একজনকে ফিজিক্যাল ট্রেনার হিসাবে সঙ্গে নিতাম।

দ্বিতীয়ত, একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। যে চারজন স্টার ফুটবলার অসুস্থ বলে প্রি-অলিম্পিক ফুটবল খেলতে যায় নি, তাদের অসুস্থতা যথার্থ কিনা খোঁজ নিতাম। কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই যদি কেউ প্রি-অলিম্পিক টুর্নামেন্টে না গিয়ে থাকে, সেই বিশেষ খেলোয়াড়কে কিছুতেই ভারতীয় দলে নেওয়ার কথা ভাবা উচিৎ নয়।

তৃতীয়ত, প্রাথমিকভাবে চল্লিশজন ফুটবলারকে ক্যাম্পে ডাকা উচিৎ। বিভিন্ন দেশে এই সংখ্যাটাই মেনে চলা হচ্ছে। এক বছর পর শারীরিক সক্ষমতা এবং ফর্মের বিচারে চব্বিশ জনকে বাছাই করে নেওয়া যায়। এরা ভারতের দু'একটি বড় টুর্নামেন্ট এবং ভারতের বাইরে কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে। টীম তৈরী হয়ে গেলে, দিল্লিতে শেষ তিন মাস রেখে কয়েকটি আমন্ত্রিত বিদেশী দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ হবে। এই ম্যাচগুলি শুধু টীমকেই চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করবে না, জাতীয়তাবোধসম্পন্ন সমর্থকদেরও সজাগ ও প্রস্তুত করবে। দেশের মাটিতে সমর্থকদের উৎসাহ নিশ্চয় খেলোয়াড়দের বাড়তি মনোবল জোগাবে। কোচের কর্তব্য, এই ব্যাপারটিকেও পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করা।

সুরজিৎ, প্রসূন, গৌতম, সুব্রত প্রভৃতি সিনিয়র প্লেয়ারদের রাখতে হবে, টীমকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য। ফিজিক্যাল ট্রেনিং ঠিক মত চললে, আশা করা যায় দুবছর পরেও এরা সক্ষম থাকবে। প্রি-অলিম্পিকে এবং ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে যারা ভারতের হয়ে খেলেছে, তাদের মধ্যে অনেককেই ক্যাম্পে ডাকা যায়। ভাস্কর, শ্যামল, মনোরঞ্জন, সত্যজিৎ, চিন্ময়, প্রতাপ, নাসির, মানস, বিদেশ, সাবির, পায়াস, হরজিন্দার, দেবরাজ, জেকব — এরা সকলেই ক্যাম্পে থাকবে। পাঞ্জাবের পারমিন্দার সিং, মহিন্দার সিং, পারমার প্রভৃতিকে রাখতে হবে ওদের লড়াই করার ক্ষমতার জন্য। গত দু' বছর সন্তোষ ট্রফির আসরে হাজির থাকা সম্ভব হয়নি। তাই গোয়ার খেলোয়াড়দের ভালভাবে দেখিনি। তবে যতদূর শুনেছি, ডায়োনিসিও, হারবার্ট, প্রকাশ, মহেশ প্রভৃতি কয়েকজনকে ক্যাম্পে ডাকা উচিত। কেরালার বালচন্দ্রন এবং টিটি যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবান। বাংলার কিছু উঠতি মুখকেও মনে রাখতে হবে। দেবাশিস রায়, অমিত বাগচী, অনুপেম দাশ, সুদীপ চ্যাটার্জী, সুভাষ রায় এবং সমর ভট্টাচার্যের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আগেও বলেছি এখনও বলছি, চেষ্টা করলে দিল্লির এশিয়ান গেমস থেকে ভারতীয় ফুটবল দল পদক ছিনিয়ে আনতে পারে। আমার দিক দিয়ে বলতে পারি, ডাক পড়লে সব ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় ফুটবলের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে রাজী আছি।

প্রসূন থেকে গেল

ধীমান দত্ত

প্রি-অলিম্পিক খেলে ভারতীয় দল যেদিন ফিরল, তার পরদিনই সাতসকালে হাজির হলাম ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন প্রসূন ব্যানার্জীর কাঁকুড়গাছির বাড়ীতে। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওর কলমে আমাদের এই পত্রিকায় প্রি-অলিম্পিকের উপর একটা রিপোর্ট করানো। আর একটা ছোট ইচ্ছেও ছিল, আগামী মরশুমে ও জার্সির রং পাল্টাবে কিনা, এটা জানা।

কিন্তু ওর বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, আগের দিন রাত দুটোর সময় ফিরেছে। তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বেলার দিকে টেলিফোনে যোগাযোগ হল। বিকেল পাঁচটার সময় ওর বাড়ীতেই কথা হবে, ঠিক হল। যথাসময়ে আবার গেলাম, কিন্তু খবর পেলাম বন্ধু সুব্রত ভট্টাচার্যর সংগে এক বিশেষ কাজে ওকে বেরোতে হয়েছে। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তখন দলবদলের বাজার গরম। প্রসূনের জন্য ইস্টবেঙ্গল পাগল। দু'একদিন আগেই শুনেছিলাম যে, ওর জন্য সর্বোচ্চ দর দিতেও ইস্টবেঙ্গল পিছ্‌পা নয়। ওদের এক বিশেষ কর্মকর্তা সেদিনই ওর বাড়ীতে গিয়ে ওকে বলেছিলেন, 'তুমি এলেই আমাদের টীম হয়ে যাবে।' বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পরই দেখলাম শৈলেন মান্না মোহনবাগানের ফুটবল সম্পাদক আর কে তেওয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

পরদিন আরও সকালে ওর বাড়ী গেলাম। প্রথমে ওর এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা হল। জানালেন, 'কাল বেশী রাতে মান্নাদারা সুব্রতকে নিয়ে আবার এসেছিলেন। গোপাল দল ছাড়ছে না। ও শুধু দাদার (প্রদীপ ব্যানার্জী) কথাটাই ভাবছিল।' এরপর প্রসূনের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বললাম, প্রি-অলিম্পিকের রিপোর্টটা নিলাম

পরদিন মান্নাদার গলাতেও একই সুর বাজল, 'গোপাল ঘরের ছেলে, ও থাকছে।' এ লেখা যখন আপনারা পড়ছেন, তখন সব প্রতীক্ষার শেষ হয়ে গেছে। ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের নিরুৎসাহিত করে ১৯৮০'র জন্য ভারতের অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জী মোহন-সবুজ জার্সিকেই আবার বেছে নিয়েছে।

দলবদলের নাটক এর অবশিষ্ট অংশ



[illegible]

তাবে আমাকে তাড়াতে চাইছে। এইরকম রটানো হবে, সেই আশঙ্কাতেই প্রদীপদার সঙ্গে একবারও দেখা করতে চাইনি। আশঙ্কাটা যখন সত্যে প্রমাণিত হল, ঠিক করলাম 'আর নয়'। প্রদীপদার কাছে আপাতত আর যাবনা। তেবে দেখলাম, গত কয়েকমাসে কর্মকর্তারাতো একবারও আমার কাছে আসেননি। সুতরাং রটেছে—আমি ধরাধরি করছি। ঠিক করেছি আর কোনো কথা নয়।"

সেই রাত্রেই পি কে-কে টেলিফোন করলাম: "আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য সুরজিৎকে আমিই বলেছিলাম। কিন্তু ময়দানে রটানো হল, সুরজিৎ 'ধরাধরি' করছে। তাই ছাব্বিশ তারিখ ও আপনার বাড়িতে যায়নি।" পি কে বললেন, "রটাচ্ছে শত্রুরা। আমার সঙ্গে নিশীথ ঘোষের পরিষ্কার কথা হয়েছে, সুরজিৎকে সসম্মানে রাখতে হবে। ও কেন ভুল বুঝছে?" আমি: "বেশ। তাহলে যিনি টীম করছেন, সেই কর্মকর্তা সব ফুটবলারের সঙ্গে কথা বললেও সুরজিতের সঙ্গে দেখা করছেননা কেন?"

১ ফেব্রুয়ারী সকালে কাঁকুলিয়া রোডে জ্যোতির্ময়বাবু আবির্ভূত হলেন। সুরজিৎকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "তুমি আগের সব কথা ভুলে যাও। তোমাকে বাদ দিয়ে কখনো ইস্টবেঙ্গল টীম হয়?" সুরজিৎ বলল, "গতবার আমার সঙ্গে ক্লাব কর্মকর্তারা যে দুর্ব্যবহার করেছেন, সেটা চট করে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান টেস্ট তিন দিন হয়ে যাওয়ার পর এলেন। যাক, অন্তত টিকিটটা চাইতে পারবনা।"

ঘন্টাখানেক কথাবার্তার পর ঠিক হল ৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর একটায় কাইজার স্ট্রীটে পি কে-র বাড়িতে টীম নিয়ে কথা হবে।

পি কে অফিসের কাজে আটকে গেলেন। সুরজিতের সঙ্গে কথা বললেন অজয় শ্রীমানী এবং জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত। সুরজিৎ একের পর এক ঘটনার উল্লেখ করে দেখাল, কীভাবে গত বছর অন্যায় করা হয়েছে। জ্যোতির্ময়বাবু সবটুকু মানলেননা, তবে অজয়বাবু প্রায় সব অভিযোগই মেনে নিলেন। মোটামুটি কথা এগোল। তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরে পি কে বললেন, "আমাকে যেমন এঁদের দরকার, তোমাকে তেমনি আমার দরকার।"

এদিকে প্রায় রোজ সকালেই ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছিল সুরজিৎ, চিন্ময় এবং বিদেশ। একদিন সকালে সুরজিৎ-চিন্ময়ের সঙ্গে ক্লাবটেন্টে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর আবার এক পশলা তর্ক হয়ে গেল। ওরা কিছুতেই গতবারের অপমানের কথা ভুলতে পারছিলনা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কথা হল, ১৭ ফেব্রুয়ারী, রবিবার চিন্ময়ের সঙ্গে এবং ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার সুরজিতের সঙ্গে সব কিছু 'পাকা' করে নেওয়া হবে।

কিন্তু মাঝে এমন দুটি ঘটনা ঘটল, যা সুরজিৎ-চিন্ময়দের চিন্তায় ফেলল। ভারত-পাকিস্তান কলকাতা টেস্টের চতুর্থ দিনে ক্লাব হাউসে এক কর্মকর্তা চিন্ময়কে বললেন, "টেস্ট শেষ হলেই তোমার কাছে যাব। তুমি কিন্তু শুধু নিজের কথা বলবে। কাউকে জড়িয়ে কথা হবেনা।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো অর্থবহ। এদিকে কলকাতায় যখন সুরজিৎকে সাদরে রাখার কথা বলা হয়েছে, ওদিকে বাঙ্গালোরে গিয়ে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত তখন মানসকে টেনে আনার চেষ্টা করছেন। মানে, মানস-বিদেশকে। খবরটা ট্রাঙ্ক কলে সুরজিতের কানে পৌঁছে গেল।

তবু, কলকাতা আর বাঙ্গালোরের খেলোয়াড়দের কথায় সুরজিৎ নরম থাকল।

কথামতো, ১৭ ফেব্রুয়ারী, রবিবার বিকেলে কর্মকর্তারা চিন্ময়ের বাড়িতে গেলেন। অনেক কথা হল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় নিল দুই পক্ষ। বুধবার সুরজিতের সঙ্গে কথা হবে, তার আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চিন্ময় প্রস্তুত ছিলনা।

কিন্তু ২০ ফেব্রুয়ারী, বুধবার ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা সুরজিতের কাছে গেলেননা। এমনকি একটা টেলিফোনও না। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্তও কারো দেখা নেই। চিন্ময়ের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ করা হলনা। আনমনা সুরজিৎকে চমকে দিয়ে চিন্ময় বলল, "আর অপমান সহ্য করা যায়না। পিন্টুদার কথাই ঠিক।"

সেদিন বিকেলে মহমেডান স্পোর্টিং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসল সুরজিৎ আর চিন্ময়। পিন্টু চৌধুরী আর অমল দত্ত ছিলেন। শ্যামল আর প্রশান্ত হয়তো এমনিতেও যেত। শুনে সকলেই অবাক হবেন, অজাতশত্রু শ্যামল ঘোষের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকে কোনো কথাই বলেননি।

সুরজিৎ শুক্রবার পর্যন্ত সময় নিল। ইস্টবেঙ্গলের লোক আসবে, এইরকম একটা আশা তখনও সুরজিৎ করছে। শুক্রবার দুপুরে সবকিছু 'পাকা' হয়ে গেল।

বৃহস্পতিবার সকালে সুরজিতের অফিসে দুজন ফুটবলার এল। মিহির এসে বলে: "শুনছি তুমি ইস্টবেঙ্গলে থেকে যাচ্ছ। সুরজিৎদা তোমার সব কিছু মেনেছি, এই ডিসিশানটা মানতে পারলাম না। এত অবিচারের পরও ইস্টবেঙ্গলে থাকবে? বরং মহমেডানে চলো, আমিও যেতে চাই।"

তারপর হৈ হৈ করে এল ডেভিড উইলিয়ামস: "আমি জানি ক্লাব অফিসিয়ালরা তোমাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে। তুমি কি তাহলে মহমেডানে যাবে? তাই যদি যাও, আমাকে সঙ্গে নাও। কলকাতায় তোমার মুখ চেয়েই থেকে গেছি। তুমি যেখানে আমি সেখানে।"



মহমেডানে সই করার পর চিন্ময়



মিহির ভাল অফার পেয়ে মোহনবাগানে গেল। তার আগে অবশ্য এক চমৎকার পদ্ধতিতে ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষকে একটা বড় ধাক্কা দিয়ে গেল। ভেক্তিডের সঙ্গে কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেল।

শনিবারের পরেই উধাও হয়ে গেল চিন্ময়, শ্যামল, প্রশান্ত, ভেক্তিড, দেবাশিস আর অমিত। প্রথমে রাঁচী, তারপর বোম্বে।

সুরজিতের সামনে তখন বড় কাজ—সিঙ্গাপুরে তিন ফুটবলারকে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানানো। বাঙ্গালোরে ট্রায়াল ক্যাম্পে চলার সময়ে ভাস্কর, সাবির আর মনোরঞ্জন বেশ কয়েকদিন ট্রাঙ্ক কলে সুরজিতের সঙ্গে কথা বলেছে। ভাস্কর বলেছে, "তুমি আর চিন্ময় যেখানে, আমি সেখানে।" সাবির জানিয়েছে, "আমি আছি।" মনোরঞ্জন বলেছে, 'হঠাৎ কোনো ডিসিশান নিওনা। তোমরা সবাই চলে গেলে আমাকেও ভাবতে হবে।"

সুরজিৎ জানত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। ভুল বোঝানো হতে পারে। কারণ বাঙ্গালোরেও ভাস্করদের জানানো হয়েছিল, সুরজিতের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেছে। কিন্তু সিঙ্গাপুরে ভাস্করদের সঠিক অবস্থাটা জানা দরকার। এই অবস্থায়, 'আনন্দমেলা' এবং 'খেলার কাগজ'—এই দুটি পত্রিকার তরফ থেকে প্রি-অলিম্পিক ফুটবল কভার করার প্রস্তাব এল। ৯ মার্চ, দোলের দিন সিঙ্গাপুর গেল সুরজিৎ।

ভাস্কর আর সাবির নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানাল : 'আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবনা।' মনোরঞ্জনও টীম ছাড়ার আভাস দিল। দেবরাজ বলল, 'যদি চাও, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে লীগ আর শীল্ড তোমাদের টীমে খেলতে রাজী আছি।'

ভারতীয় দল ইন্দোনেশিয়া সফরে গেলেও মনোরঞ্জন সিঙ্গাপুর থেকে সরাসরি কলকাতায় ফিরে এল। বাড়িতে কথা বলে এবং নিজে সবকিছু ভেবে, ইস্টবেঙ্গলেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। মনোরঞ্জন ফেরার পরদিন মহমেডান সভাপতি একফান তাহের কোচ অমল দত্তকে বলেন, মনোরঞ্জন কনফার্মড।' তাহের সাহেব দায়িত্বশীল লোক। মনোরঞ্জনও মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয়। বোঝা-বুঝির ক্ষেত্রে কোথাও হয়তো একটা ভুলের ফাঁক থেকে গিয়েছিল।

১৭ মার্চ ভারতীয় দলের মাদ্রাজে ফেরার কথা। ভাস্কর আর সাবিরকে আনার জন্য সুরজিৎ আর চিন্ময় গেল। দমদম এয়ারপোর্টে সত্যজিৎ বলল, 'তোমরা যখন যাচ্ছ, আমার দিয়ে কোনো লাভ নেই।' আরো কিছু কথা বলল, কিন্তু সেসব প্রকাশের সময় এখন নয়।

১৯ মার্চ মনোরঞ্জন এবং ওর বাবাকে অভিনন্দন জানাতে ওদের বাড়িতে গেলেন পি কে এবং নিশীথ ঘোষ। ভাস্করের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন নিশীথবাবু। কিন্তু চিন্ময় থাকায় সে সুযোগ এলনা।

২০ মার্চ ভাস্কর আর সাবিরও ইস্টবেঙ্গল ছাড়ল। জানুয়ারির মাঝামাঝি এক দুপুরে ইস্টবেঙ্গলের এক মাঝারি কর্মকর্তা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'সুরজিৎকে রাখবনা।' চটপট চিন্ময় সংগে সংগে জবাব দিয়েছিল : 'সুরজিৎদাকে না রাখলে অন্তত আটজন ইস্টবেঙ্গল ছাড়বে।' সেই কর্মকর্তা : 'বিশ্বাস করিনা। বড় জোর তিনজন টীম ছাড়বে।' চিন্ময় বলেছিল 'হাতের কড় তো গুনতে জানেন, সুরজিতদাকে তাড়ালে, গুণে নেবেন আটজন টীম ছাড়ে কিনা।' মিহিরকে নিয়ে সত্যিই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম সারির আটজন টীম ছেড়ে চলে গেল।

একটি বিশিষ্ট দৈনিকপত্রের রিপোর্ট বলছে, ইস্টবেঙ্গলের এক কর্তা বলেছেন, 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' কে দুষ্ট গরু? উনিশশো আটাত্তর সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর কারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তা কি মনে আছে? অমল দত্ত দুষ্ট গরু? অরুণ ঘোষ দুষ্ট গরু? রঞ্জিত মুখার্জী, তপন দাস দুষ্ট গরু? পিন্টু, সুরজিৎ শ্যামল — সবাই দুষ্ট 'গরু'?

তাহলে ভাল 'গোয়ালা'দের কাছে প্রশ্ন, আপনারা ভাল 'গরু' এনে টীম জোরদার করলেন না কেন? ইস্টবেঙ্গলের যে হাজার হাজার সমর্থক রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে টীমের জিৎ দেখতে আসেন, শূন্য গোয়াল তাদের কী দিতে পারে? সুরজিৎরা 'দুষ্ট গরু' এই অভিযোগ তর্কের খাতিরে মেনে নিয়েও তাই ইস্টবেঙ্গল জনতা প্রশ্ন তুলতে পারে, বিকল্প ব্যবস্থা করা হলনা কেন? টীমই যদি না করতে পারেন, খেলোয়াড়দের পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে যান কেন? মোহনবাগান থেকে কোনো স্টারকে ছিনিয়ে আনা তো দূরের কথা, অমিত বাগচী - দেবাশিস রায়দেরও নেওয়া গেলনা। এইসব ব্যর্থতার জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত আছেন তো, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত এবং নিশীথ ঘোষ? চিন্ময় মহমেডানে সই করার পরও প্রেমনাথ ফিলিপ্সকে, পিন্টু-প্রশান্ত মহমেডানে মজুত থাকার পরও অমলরাজকে বা সাবির-ভেক্তিড মহমেডানে যাবার পরেও যারা আকবরকে টেনে নিতে ব্যর্থ হন, ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবের কর্মকর্তা থাকার অধিকার কি তাদের আছে?

ইস্টবেঙ্গলের কয়েকজন কট্টর সমর্থক বললেন, কর্মকর্তারা অন্যায় করেছে। ওদের ওপর সুরজিতের রাগ সংগত। কিন্তু সমর্থকদের প্রতি কি সুরজিতের কোনো কর্তব্য নেই? ভালবাসা নেই?

এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে স্বয়ং সুরজিৎ : 'আমি যতটুকু হয়ে উঠতে পেরেছি, তার অনেকটাই ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের ভালবাসার দান। ওরা আমায় ভালবাসেন। আমিও ওদের ভালবাসি। কিন্তু তাঁরা তো দেখেননি, কীভাবে দিনের পর দিন আমাদের অপমান করা হয়েছে। আমাকে বেশি, তবে অন্যরাও বাদ যায়নি। নানা সূত্র থেকে যখন খবর পেলাম আমাকেও পিন্টুদার অবস্থায় ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে, ভেবেছিলাম 'ময়দান' ছেড়ে দেব। পিন্টুদা মনে জোর না দিলে, হয়তো সত্যিই ছেড়ে দিতাম। মুশকিল হচ্ছে এই, মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার দল লক্ষ লক্ষ সমর্থকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী — অন্তত ক্লাবের মধ্যে। তাই অপমানিত এবং প্রতারিত হবে গলায় শেষ কোপটা পড়ার আগে ছিটকে বেরিয়ে এসেছি। মহমেডানের সঙ্গে সব কথা হয়ে যাবার পরও ভেবেছি, ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ ভুল স্বীকার করে আমাকে ফিরিয়ে নিতে আসবেন। তাহলে মনকে শক্ত রাখা হয়তো কঠিন হত। কিন্তু না, সিঙ্গাপুরেও জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত একটি কথাও বলেননি। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের কাছে আবেদন, আমাকে ভুল বুঝবেন না, যেমন ভুল বোঝেননি পিন্টু চৌধুরীকে। দীর্ঘ ছয় বছর যে জার্সি গায়ে চড়ালাম, যে টেন্টে কেটে গেল আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় ভরা এতগুলো দিন — তাকে কি আমি



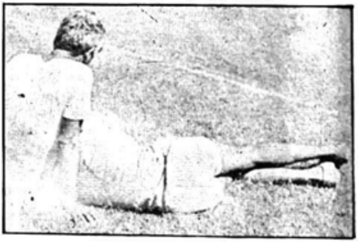
ভুলে যেতে পারি। যাদের ব্যবহার শ্যামল ঘোষের মতো ছেলেকেও ক্ষুব্ধ করে, তাদের সঙ্গে কী করে থাকা যায়? একটা কথা ঠিক, এবার আমরা প্রাণপণে সাদা-কালোর হয়ে লড়ব। কিন্তু সময় এলে একদিন লাল-হলুদ জার্সির পতাকা ওড়াতে আবার মাথা তুলব।'

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি ইস্টবেঙ্গল জনতার মনে খোঁচা মারছে তা হল এই: অভিমানে যদি ক্লাব ছাড়তেই হয়, সুরজিৎ একা না গিয়ে দল বেঁধে চলে গেল কেন?

সুরজিৎ বলছে: "অন্তবিস্তর সকলেই অপমানিত হয়েছে। তাই ক্ষোভটা আমার একার ছিলনা। বাড়িতে থেকেও সাবির আলির সঙ্গে দেখা করেননি নিশীথ ঘোষ।

তাই ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার সিদ্ধান্তটা আমার একার নয়। আমরা পরস্পরের ভালমন্দের কথা ভাবি, এটাও তো কোনো অন্যায় নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যে একটা 'প্রতিবাদ' হিসেবে ক্লাব ছেড়েছি তার প্রমাণ—সকলেই এক টীমে সই করেছি। অন্তত চারজনের কাছে মোহনবাগানের অফার ছিল। বিশেষ কারণে মিহির মোহনবাগানে গেছে, কিন্তু বাকী তিনজন মহমেডানে আসার ঝুঁকি নিয়েছে। একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, আমাদের যৌথ সিদ্ধান্ত হল ভবিষ্যতে ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন গড়ার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।"

আগামী কয়েক মাস ময়দান উত্তাল থাকবে। হয়তো সাদা-কালো আর লাল-হলুদের লড়াই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের চেয়েও বেশি টেনশন নিয়ে হাজির হবে। সুরজিৎকে রোখার জন্য লড়ে যাবে সত্যজিৎ সাবিরের মাথা থেকে বল ছিনিয়ে নেবে মনোরঞ্জন। তবু একদিন উত্তেজনা প্রশমিত হবে। উনিশশো একাশি আসবে নতুন সম্ভাবনার আলো ফুটিয়ে। শঙ্কর ভাই, আপনি প্রস্তুত থাকুন। সমস্ত অন্যায়ের দেওয়াল চূর্ণ করে একদিন ইস্টবেঙ্গল টেন্টে ফিরে আসবেই অপমানিত কিন্তু প্রতিবাদী দুই ঝড়ের নায়ক। ইস্টবেঙ্গলের কালো এবং ভালোমানুষ শঙ্করভাই, দু'চোখে আনন্দাশ্রু এবং দুহাতে পনেরো আর আঠেরো নম্বর জার্সি নিয়ে সেদিন আপনিই ওদের বরণ করে নেবেন।



শেষ খবর

- দিলীপ পালিত ২৪ মার্চ ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে দলবদল করলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, ২১ মার্চ রাত্রে দিলীপ পি কে ব্যানার্জীর বাড়ীতে গিয়ে লিখিত এবং মৌখিকভাবে গতবারের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং ইস্টবেঙ্গলে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে।
- এবার মহমেডানের ক্যাপ্টেন কে? গুজব রটছে— সুরজিত। আর একটি গুজব –সমরেশ। আসলে এই দুজনের মধ্যে কেউই অধিনায়ক হতে আগ্রহী নয়। এ বছর মহমেডানের ক্যাপ্টেন অমলরাজ।

আগামী সংখ্যায়

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ: প্রচ্ছদ কাহিনী 'প্রসূন ইষ্টবেঙ্গলে গেল না কেন?' সুকুমার সমাজপতির 'দল বদলের পরে।' প্রদীপ নাগের 'জুবিলি টেস্টের আম্পায়ার।' ইরাণের কোচ হাবিবির সঙ্গে সুরজিৎ সেনগুপ্তর সাক্ষাৎকার। আরো অনেক লেখা।

খেলার কাগজের পক্ষে শ্রীমতী দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন সেলস্ কনসার্ন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীনিতাই পদ কুন্ডু কর্তৃক দীপ্তি প্রিন্টিং এণ্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ৯৩এম আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬৭ হইতে মুদ্রিত।


গাভাসকার / শান্তি সেন

Declaration No. WB/67/80 KHELAR KAGOJ



গৌতম সরকার শ্রেণিক শেঠ

মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র